ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

৬২ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ।। ২৩ ফাল্গুন, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ৮ মার্চ, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

মুসলিম সংরক্ষণ

তোষণেরই নামান্তর

অমলেশ মিশ্র।। এদেশের রাজনীতিতে পোষাকী বাংলায় সংখ্যালঘু তোষণ, আর গোদা বাংলায় মুসলিম তোষণ, আমরা জাতির জনকের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছি। এদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে বেশী ভোট পাবে সেই নির্বাচিত হবে। বেশী বলতে অর্দ্ধেকের বেশী, মানে ৫১-৫২ নয়। ২১ বা ৩১ হলেও চলবে। তা এই নির্বাচিত হওয়ার জন্য থোক ভোট লাগে। একটা একটা করে ৩১টা ভোট হতে সময় এবং শ্রম দুটোই লাগে। ৩১-এর মধ্যে ২০টা যদি থোক ভোট হয় বাকী ১১টা জোগাড় করা যায় এক এক করে।

মুসলমান তোষণের মূল কথা এই থোক ভোট। মুসলমানদের উন্নতির বিষয়ে সত্যি সত্যি যদি সহৃদয় সামাজিক চিন্তা থাকত তাহলে প্রথমেই যে কাজটি

সোজা-সাপ্টা

করা উচিত ও প্রয়োজন ছিল তা হলো-মুসলমানদের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণে উৎসাহ দেওয়া এবং সাধারণ স্কুল কলেজে পড়তে পাঠানো।

একথা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য যে দেশ ভাগের কারণে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত বহু মুসলমান এ দেশ ত্যাগ করেছেন। ফলে নিম্নবিত্ত এবং স্বল্পবিত্ত মুসলমানের সংখ্যা এদেশে বেশীই থেকে গেছে। মধ্যবিত্ত মুসলমান আজকের দিনেও যথেষ্ট কম। আর এই নিম্নবিত্ত ও স্বল্পবিত্তদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে বাধা দেওয়া হয়। মাদ্রাসায় পড়তে বলা হয় ইসলামি নিয়ম দেখিয়ে। অথচ পৃথিবীর বহু ঐস্লামিক দেশ জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অবহেলা করেন না। ছেলে-মেয়েদের সাধারণ স্কুল-কলেজে পড়তে পাঠান। এও শোনা গেছে যে তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের খাতিরেই। শিক্ষা ব্যবস্থাও বদলেছে। এদেশে মুসলমানদের উন্নতি ঘটানোর জন্য নানা রকম সুযোগ সুবিধা বন্টন করার অভ্যাস রাজনীতিকদের তৈরী হয়েছে। সরকারি টাকা দেদার বিতরণ করে কিছু থোক ভোট আদায় এদের লক্ষ্য। মুসলমানদের উন্নতি এদের লক্ষ্য নয়। কিন্তু এইভাবে সাময়িক ভাবে কিছু সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিলেই যে একটি নিম্নবিত্ত সমাজ মধ্যবিত্ত সমাজে পরিণত হবে এমন কথা কেউই বিশ্বাস করেন না। তবু করেন থোক ভোটের জন্য।

(এরপর ৪ পাতায়)

সিপিএম-তৃণমূলে মুসলিম দুষ্কৃতীরা
নানুরে আক্রান্ত হিন্দু গ্রাম

বিশেষ সংবাদদাতা, বীরভূম ঃ অগ্নিগর্ভ নানুরে মুসলিম দুষ্কৃতীরাই রাজনীতির নিয়ন্ত্রক। তাই পরিকল্পিতভাবে সংঘর্ষের নামে আক্রমণ হয় নানুরের হিন্দুপ্রধান গ্রামগুলিতে। অথচ ডান-বাম সব দলই ভোটের স্বার্থে মুসলিম তোষণে ব্যস্ত। পুলিশ দর্শক মাত্র।

বীরভূম জেলার দক্ষিণপ্রান্তে বর্ধমান জেলা লাগোয়া নানুর ব্লক। এই এলাকার বাসিন্দাদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। নতুন উপার্জনের মাধ্যম হলো বাড়িতে বাড়িতে বোমা ও মাসকেট বানানো। সেই বোমা, বন্দুক জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এমনকী ভিন্ন জেলায় সরবরাহ হয় অর্ডার মতো। এই ক্ষেত্রে কোনও ছুঁৎমার্গ নেই। যে দলই চায় টাকার বিনিময়ে তারাই পেয়ে যান সঠিক সময়ে। আর এই সমস্ত দুষ্কৃতীদের শক্ত ঘাঁটি সারা নানুর। কারবারীরা প্রায় সবাই মুসলমান। তাদেরই নিয়ন্ত্রণে চলে নানুরের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক কাজকর্ম। দুষ্কৃতীদের অঙ্গুলি হেলনে বর্তমানে নানুরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়।

২০০৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সারা বছরই যে নানুর সংবাদের শিরোনাম তার মূল উৎসই হলো দুষ্কৃতীরা। এক সময় যারা শাসকদলের অঙ্গুলি হেলনে জেলার এবং জেলার বাইরে যেত সন্ত্রাস করে এলাকা দখলের জন্য, তারাই আজ সেই সিপিএমের হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে। কুখ্যাত দুষ্কৃতীরা সুযোগ বুঝে পরিবর্তনের হাওয়ায় বিরোধী তৃণমূলের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিয়েছে। যাতে সহজে তারা নানুরে বসেই তাদের বোমা অস্ত্রের কারবার চালাতে পারে। তাই নানুর ব্লকে একের পর এক গ্রাম দখলে নেমে দুষ্কৃতীবাহিনীর সংঘর্ষ প্রকাশ্যে আসছে রাজনৈতিক সংঘর্ষের মাধ্যমে। সিপিএম বর্তমানে স্থানীয় দুষ্কৃতীদের না পাওয়ায় মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান থেকে মাসকেট বাহিনী নিয়ে এসে এলাকা দখলে রাখার চেষ্টা করাতেই সংঘর্ষ বেধে যাচ্ছে।

উভয় দলের এই গ্রাম দখলের লড়াই-এ মুসলিম দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিতভাবে হিন্দু প্রধান গ্রামে হামলা চালাচ্ছে। গ্রামের মহিলারা শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়ে রাতের পর রাত খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাচ্ছেন। পারাসারা, থুপসড়া, জলুদ্ধির মতো হিন্দুপ্রধান গ্রামগুলিতে অবাধে হামলা চালায় উভয় দলের আশ্রিত সমাজবিরোধীরা। পাতিসারা গ্রামের বাসিন্দা সাবিত্রী বাউড়ি বলেন, রাত হতেই হার্মাদ বাহিনী মাসকেট, বোমা নিয়ে বাড়িতে হামলা করে সর্বস্ব লুট করছে। মহিলাদের গায়ে হাত দিচ্ছে। ইজ্জত বাঁচাতে মাঠের মধ্যে খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাচ্ছে তারা।

একই অবস্থা থুপসড়া গ্রামের দাসপাড়া ও মেটেপাড়ায়, যেখানে একরাতে ২৮টি হিন্দু বাড়িতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ তৃণমূল নেতা সুদীপ ব্যানার্জী, জেলা সিপিএম সম্পাদক দিলীপ গাঙ্গুলীরা এই বিষয়ে নীরব দর্শক হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে শুধু দোষ চাপিয়ে দায় সেরেছেন

(এরপর ৪ পাতায়)

দশ মাসে ৩১ হাজার ভোটার বেড়েছে কালিয়াচকে

তরুণকুমার পণ্ডিত ঃ মালদা।। ২০১১ সালে সারা দেশের সঙ্গে মালদা জেলাতেও জনগণনা শুরু হবে। কিন্তু কালিয়াচকের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলায় গোয়েন্দা বিভাগ চিন্তায় পড়েছে। কালিয়াচকের তিনটি ব্লকের ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ বেশি। গোয়েন্দা বিভাগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৯ সালে কালিয়াচক থানার সুজাপুর বিধানসভার আসনে পরপর দুবার উপনির্বাচন হয়। ওই কেন্দ্রে মাত্র ১০ মাসের ব্যবধানে প্রায় ৩১ হাজার নতুন ভোটার হয়েছে। মুসলিম জনসংখ্যার এইসব মানুষ এমন প্রচুর আছে যারা বাইরে থেকে এসেছে এবং রাজনৈতিক নেতাদের প্রচ্ছন্ন মদতে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিয়াচকের আলিপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শেরশাহি, সুজাপুর, মোজমপুর, জালুয়াবাধাল, জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চরিঅনন্তপুর, দুইশত বিঘা, মহব্বতপুর, শ্মশানী গ্রামগুলি অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। এইসব মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলি গোয়েন্দা ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। কালিয়াচক পুলিশ জানিয়েছে কয়েক মাসের মধ্যে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা, জাল নোট চক্রে জড়িত সন্দেহে যে সব ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের বেশির ভাগই কালিয়াচকের বিভিন্ন ভাড়া বাড়িতে থাকত। প্রশাসন ও পুলিশের একাংশ জানিয়েছে, শেরশাহি এলাকার কিছু বাসিন্দা বলেছেন যে, এখানে অনেক পরিবার রয়েছে যাদের বাড়ির মালিক থাকে বাংলাদেশে।

বেশ কিছু সংখ্যালঘু মানুষ চোরা-কারবার, আফিম চাষকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে। মালদার পুলিশ সুপার ভুবন মণ্ডল বলেন, পুলিশ সতর্ক রয়েছে। পুলিশ ক্যাম্পও বাড়ানো হয়েছে। তবে রাজনৈতিক দলগুলি জমি দখল ও হিংসা বন্ধ না করলে কালিয়াচক যে আগামী দিনে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

অনুপ্রবেশের অকাট্য প্রমাণ

মালদা জেলার থানা অনুসারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি - ১৯৬১-২০০১

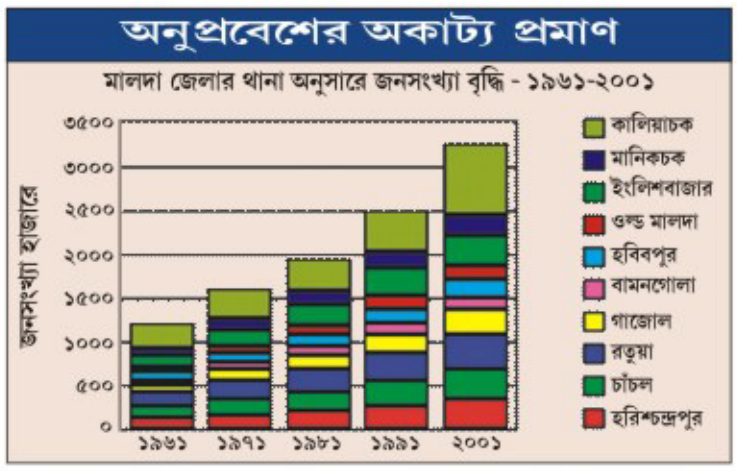

মমতার দ্বিচারিতা

মন্ত্রিসভার শরিক, সিদ্ধান্তের নন

গূঢ়পুরুষ।। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ইউপিএ সরকারের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ২০১০ আর্থিক বছরের জন্য বাজেট প্রস্তাবে পেট্রল-ডিজেলের বেশ বড়সড় মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। প্রণববাবুর বাজেট প্রস্তাব কার্যকর হওয়ার কথা পয়লা এপ্রিল থেকে। কিন্তু পেট্রল-ডিজেলের বর্ধিত দাম বাজেট প্রস্তাব সংসদে পেশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকর করা হয়েছে। এ কথা সকলেরই জানা যে পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ালে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণে। এক কথায়, বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর দাম সাধারণ মানুষের একেবারে নাগালের বাইরে চলে যাবে। দেশজুড়ে খোলা বাজারে জিনিসপত্রের দাম অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাল, গম, চিনি ইত্যাদির মজুত ভাণ্ডার প্রায় শূন্য। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে সামনের খরা মরশুমে ভুখা মিছিল, খাদ্য-দাঙ্গা নিত্যদিনের ঘটনা হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রণববাবুরাও এ কথা জানেন। সামনে কোনও বড় নির্বাচন নেই। থাকলে জনরোষে তাঁদের গদি হারাতে হোত।

বিপদে পড়েছে ইউপিএ শরিক তৃণমূল এবং তাদের দলের নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। চলতি বছরে পশ্চিমবঙ্গে ৮২টি পুরসভার নির্বাচন। রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদলের সেমিফাইনাল। সম্ভবত মে মাসে পুরসভাগুলির সঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন হবে। তখন রাজ্যজুড়ে খরা মরশুম চলবে। জনরোষ কেন্দ্রের কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের উপর আছড়ে পড়তে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গে

(এরপর ৪ পাতায়)

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে দর কষাকষি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। লোকসভা ভোটের পর থেকে নিত্যপণ্যের জিনিসপত্রের দাম যেন সব ধরনের সীমারেখা ছাড়িয়েছে। সাধারণের প্রতিদিনের ডাল-ভাত জোটাবার সংস্থানও এখন কষ্টসাধ্য। কারণ বাজারে ডালের গড়পড়তা দাম সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়েছে। চালের বাজারও তেজি। এছাড়া তেল, অন্যান্য মশলাপাতি, আটা, ময়দা, সিমেন্ট, রড, কয়লা, গৃহস্থালির জিনিসপত্রের দামও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। চিনি দামের কারণে এখন তেতো লাগছে। হাত দেওয়া যাচ্ছে না সবজিতেও। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। এরকম এক পরিস্থিতিতে কংগ্রেস, সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেস যেন কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলছে। দিল্লি এবং কলকাতার দুই সরকারই তাদের নিজস্ব ভূমিকা পালনে ব্যর্থ। মূল্যবৃদ্ধি রোধে এই সরকারি ব্যর্থতা নিয়ে পথে ঘাটেও সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। তবুও হেলদোল নেই সোনিয়া, বুদ্ধদেব, মমতাদের। এই ত্রয়ী মিলে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে নানা বুলি আওড়ালেও আমজনতা বাজারে

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

পাকিস্তানে দোষ নেই অচ্ছুত কেবল 'টোডি'রাই

সত্যবান মিত্র।। পাক জঙ্গিরা দেশ জুড়ে একের পর এক আক্রমণ শানিয়ে যাচ্ছে; সেদেশে প্রকাশ্যে ভারত বিরোধী ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করা হচ্ছে আর সরকার তাতে মদত যোগাচ্ছে। তবু ওদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে হবে কারণ খেলা আর রাজনীতি নাকি এক করে দেখা উচিত নয়। কাসভের দল মুম্বাই আক্রমণ করে একাধিক নরহত্যা ও ধ্বংসলীলা চালিয়েছে;পুণেতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে—তবু ওদের সঙ্গে গান-বাজনা করতে হবে। কারণ সন্ত্রাসবাদ ও সংস্কৃতিকে নাকি এক করা উচিত নয়। আর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে রে রে করে উঠতে হবে কারণ তা না করলে নাকি ওদের সঙ্গে সম্পর্ক মোলায়েম থাকবে না। পাক ক্রিকেটারদের ভারতে খেলা সংক্রান্ত বিতর্কে শাহরুখ খানের মন্তব্য ও পরবর্তীকালে মুম্বাইতে শাহরুখের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। তথাকথিত যুক্তিবাদী ও সিংহভাগ গণমাধ্যমের যুক্তি ছিল—রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতিকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

অশোক টোডি

শাহরুখের বিশাল আকারের হোর্ডিং-এ মালা দিয়ে এই কলকাতাও নাকি বার্তা দিল—তারা পাকিস্তান সম্পর্কে শাহরুখের বক্তব্যকেই সমর্থন করেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই খবর হলো—অশোক টোডির পারিবারিক হোসিয়ারী ব্যবসা—'লাক্স-কোজি-র বিজ্ঞাপনে মডেল হওয়ার জন্য শাহরুখ খান

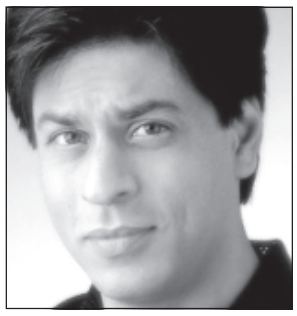

শাহরুখ

চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই কলকাতা থেকে একদল লোক, সংখ্যায় যতই কম হোক না কেন, প্রতিবাদ করলেন—শাহরুখ খান লাক্স-কোজির মডেল হতে পারবেন না। কারণ এই সংস্থার অন্যতম মালিক অশোক টোডি রিজওয়ানুর রহমানের মৃত্যু সংক্রান্ত মামলায় 'অভিযুক্ত'। প্রতিবাদ ওঠামাত্র রাতারাতি শাহরুখ ওই চুক্তি বাতিল করেছিলেন। ওই মামলাটি এখনও বিচারাধীন। এই মৃত্যু হত্যা না আত্মহত্যা তাও এখনো আদালত স্পষ্ট করে দেয়নি। অথচ তৃণমূলের প্রশ্রয়ে একদল মানুষ ইতিমধ্যে রায় দিয়ে দিয়েছেন, তাদের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে টোডি-পরিবার। শাহরুখ বা তার হয়ে কয়েকদিন আগেই তুফান তোলা গণমাধ্যম একবারও প্রশ্ন তুলল না—অশোক টোডি বা তার পরিবার কি 'অস্পৃশ্য' ঘোষিত হয়েছে? টোডিদের ব্যবসা, তাদের সংস্থা সবকিছুই কি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে? যদি হয়ে থাকে কে করেছে সেই ঘোষণা—নাকি এও একধরনের 'ফতোয়া'। যে কোনও মৃত্যুই দুঃখজনক—রিজওয়ানুরের মতো এক তরতাজা যুবকের অপমৃত্যু সবাইকে বিষণ্ণ করে তোলে। কিন্তু রিজওয়ানুর ভারতবর্ষের একমাত্র মানুষ নন্ যার রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে। রিজ্ একমাত্র প্রেমিক ছিলেন না যাকে 'প্রেমের জন্য' প্রাণ দিতে হয়েছে। অন্যসব ক্ষেত্রেই কি সংশ্লিষ্ট যুবক-যুবতীর বাবা-মা, তাদের ব্যবসা সবকিছু 'সামাজিক বয়কটের' সিদ্ধান্ত হয়েছে?—এ প্রশ্ন শাহরুখের তোলা উচিত ছিল।

অশোক টোডি অভিযুক্ত মাত্র, দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত নন্। এখনও তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং আদালত তাকে শাস্তি দেবার আগে 'ফতোয়া' দিয়ে যারা 'একঘরে' করার শাস্তি ঘোষণা করে তারা কতটা নিরপেক্ষ বা প্রগতিশীল! ইদানীং নৈতিকতা সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন তুললেই 'সোস্যাল পুলিশিং' (social-policing)-এর অভিযোগ তোলা হয়। বলা হয় ন্যায়-অন্যায় বিচারের ও শাস্তি দেবার একমাত্র অধিকারী প্রশাসন, আইন ও আদালত। তাহলে আদালতের বিচার শেষ হওয়ার আগেই কেন টোডিদের 'একঘরে' করার শাস্তি। এই একুশ শতকের পশ্চিমবঙ্গের কোন্ দলের মানুষ, এখনো একুশে আইনে—'এক ঘরে' করে রাখার সমর্থক!

শাহরুখ একজন পেশাদার অভিনেতা। তিনি বললেই পারতেন—'যে কোনও বৈধ বিজ্ঞাপনে মডেল হওয়া আমার পেশা। কোম্পানীর মালিক বা অংশীদারদের বিরুদ্ধে

(এরপর ৪ পাতায়)

এই সময়

বি টি গেরো

বি টি বেগুন নিয়ে মহাগেরোয় পড়েছে ইউ পি এ সরকার। এতদিন এই বেগুনটা কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী জয়রাম রমেশ, সেইসাথে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারকেই উত্ত্যক্ত করছিল। সম্প্রতি এটি জ্বালাতে শুরু করেছে প্রথম ইউপিএ সরকারকেও। এই জ্বালানোর সূত্রপাত, এন বি এ (ন্যাশানাল বায়োডাইভার্সিটি অথরিটি) সম্প্রতি অভিযোগ করেছে, আজ থেকে বছর পাঁচেক আগেই 'জেনেটিক্যালি মডিফায়েড' বি টি বেগুন নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল এদেশে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভারতীয় শস্য গবেষকরা এনিয়ে কাজ করতেন। কিন্তু ২০০২, জীববৈচিত্র আইন অনুসারে দেশের জীনগত উৎসকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিতে হবে। ব্যাঙ্গালোরের একটি বেসরকারি বৈজ্ঞানিকদের দল অভিযোগ করেছেন—প্রচ্ছন্ন সরকারি মদতেই দেশের 'জেনেটিক রিসোর্স'-কে অবহেলা করে বি টি বীজের মতো 'ফরেন (অ্যালায়েন) জেনেটিক রিসোর্স'-কেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তসলিমা ভাইরাস

পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের মধ্যেই তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে অসভ্যতাটা এতদিন সীমাবদ্ধ ছিল, এবার তার রেশ পড়ল ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে। ব্যাঙ্গালোরের অদূরে শিমোগায় জনৈক দৈনিক সংবাদপত্রে তসলিমার লেখা একটি প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে আগুন ছড়ালো গত ১ মার্চ। প্রতিবেদনটি ছিল মুসলিম নারীদের বোরখা পরা নিয়ে। আর তাতেই আঁতে ঘা লাগে মৌলবাদী মুসলিমদের। এলাকাটিতে দুই চাকার যানবাহন, ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে সশস্ত্র হামলা চালায় তারা। লাগোয়া হাসান শহরেও আক্রান্ত হন সাধারণ মানুষ। বাধ্য হয়ে গুলি চালায় পুলিশ। হামলায় নিহত দুই, আহতের সংখ্যা আট।

পাক-চক্ষু চড়কগাছে

ভারতসীমার ৭০ কিমি ভিতরে পোখরানের চন্দন রেঞ্জ-এ ভারতীয় বায়ুসেনার ১০৭টি বিমান যে অদম্যশক্তি ও অসমসাহসিকতার পরিচয় দিল গত ১ মার্চ তাতে পাকিস্তানের চক্ষু যে চড়কগাছে পৌঁছে যাবে তা বলাই বাহুল্য। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ. কে. অ্যান্টনির উপস্থিতিতে বায়ুসেনার পক্ষ থেকে এই মহড়ার আয়োজন করা হয়। এর নামকরণ করা হয়েছিল বায়ুশক্তি ২০১০। রাতের দিকেই এই মহড়া আয়োজিত হয়েছিল। এতে সুখোই ৩০ এম কে আই, জাগুয়ার, মীরাজ ২০০০, মিগ যুদ্ধ-বিমান ছাড়াও কয়েকটি যাত্রী-পরিবাহী বিমান যেমন এ এন ৩২ এবং আঘাতকারী হেলিকপ্টার মী ৩৫ ও মী ১৭ এতে অংশগ্রহণ করে। যদিও ২৮টি দেশকে এই 'গেমস' দেখার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু বিদেশ-সচিব পর্যায়ের বৈঠকের পর ভারতের এই 'অনভিপ্রেত আচরণ' পাকিস্তানের 'গেমস' দেখার মজাটাই মাটি করে দিয়েছে!

হস্তিশাবক

নাদুস-নুদুস চেহারা নিয়ে ট্রেনলাইন পার হচ্ছিলেন তিনি। আচমকাই ধেয়ে এল একটি ট্রেন। গর্ভবতী ওই মহিলাটির পক্ষে তড়িঘড়ি লাইনের ওপারে পৌঁছনো সম্ভব হলো না। ফলে ট্রেনে কাটা পড়লেন তিনি। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বসন্তের দক্ষিণা বাতাসের আগমনে দোল উৎসবের আগমনী বার্তায় প্রকৃতি যখন নিজেকে রাঙিয়ে তুলেছে ঠিক তখনই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা অসমের গৌহাটি শহরতলীর ডিপোর বিল সংরক্ষিত অরণ্যে ঘন-বিষাদের ছায়া নামিয়ে আনল। ট্রেনে কাটা পড়া গর্ভবতী মহিলাটি আসলে একটি হস্তিনী। দুঃখের মাঝেও সুখের কথা, হস্তিনীটি মারা যাবার পূর্বে একটি হৃষ্ট-পুষ্ট সন্তানের জন্ম দেয় এবং সেই সন্তানটি স্থানীয় চিড়িয়াখানায় বনকর্মীদের যত্ন-আত্তিতে এখনও অবধি বেশ ভালই আছে।

ভারতবিরোধিতায় হাতিয়ার ইউনান

অসমভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন উলফা (ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব্ অসম)-র কম্যান্ডার ইন চীফ পরেশ বড়ুয়ার আশ্রয়দাতা চীন-ই। আর এই চীনকে ঘিরেই তার ভারতবিরোধী কার্যকলাপের জাল ছড়াতে চাইছেন বড়ুয়া। এই খবরটায় কোনও নতুনত্ব নেই। বরং বহু ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে যাওয়া খবরটির উল্লেখ কিঞ্চিৎ বিরক্তিরই উদ্রেক করে। কিন্তু অভিনবত্ব হলো, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারও এনিয়ে গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সতর্ক হয়েছে। এই সেই ইউ পি এ সরকার, ভোটে জেতার পরে যাঁরা এই খবরের ন্যূনতম সত্যতাই স্বীকার করতে চাননি। কিন্তু কেন্দ্রকে পাঠানো গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, গত বছর মায়ানমারের কাচিন প্রদেশ থেকে জঙ্গিরা সরে আসে চীনের ইউনান প্রদেশে। এখন এই ইউনানকে ভিত্তি করেই তার 'অপকর্মে'র জাল বিস্তার করতে চাইছেন পরেশ বড়ুয়া।

নিরাপত্তা জোরদার

২৮ বছর পরে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেছে হকি বিশ্বকাপ। আর পাক-জঙ্গিরাও এমন মওকা ছাড়তে নারাজ। বিশ্বকাপ চলাকালীন গোলমাল পাকানোর অর্থ সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। জঙ্গিদের আরও চটিয়ে দিতে পারে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই ভারতের পাকিস্তানকে ৪-১ গোলে পরাজিত করা। সুতরাং জঙ্গি হামলা ঠেকাতে নয়াদিল্লী স্টেডিয়ামে ১৬ হাজার দর্শকের জন্য ৫০০০ পুলিশকর্মী, ১০০ কম্যান্ডো এবং হাজার খানেক প্যারামিলিটারি বাহিনীর নিয়োগ। কিন্তু এই যাবতীয় নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছিল বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচের পূর্বে। ম্যাচ জেতার পর দিল্লীবাসীর যুগপৎ আশা ও আতঙ্কের কারণ, আগের চাইতে জোরদার নিরাপত্তা। এতে আশা, জঙ্গি হামলার আশঙ্কা কমবে আর আতঙ্ক, অত্যাধিক তল্লাশীতে 'দুর্দশাগ্রস্ত' হবেন সাধারণ মানুষ।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বাজেটে ৯০টি মুসলিম অধ্যুষিত জেলার জন্য বিশেষ বরাদ্দ

কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আবার একটি আর্থিক পূর্ণাঙ্গ বাজেট সংসদে পেশ হইয়াছে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি '১০। দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের কার্যকাল ২০০৯ সালে শুরু হইবার পর হইতেই নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য যেভাবে দিনে রাতে লাফাইয়া লাফাইয়া বাড়িতে বাড়িতে আকাশচুম্বি হইয়াছে, তাহাতে জনগণের আশা ছিল এইবারের বাজেটে হয়ত এই মূল্যবৃদ্ধি হইতে মুক্তি পাইবার কিছু উপায়ের হদিশ মিলিবে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। বাজেটে এই মূল্যবৃদ্ধি রুখিবার উপায় বাতলান তো দূরের কথা, বরং অনেক ক্ষেত্রেই মূল্যবৃদ্ধি আরও বাড়াইবারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৈল কোম্পানীগুলোর উপর প্রদেয় ভর্তুকি তুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। খাদ্য ও সারের উপর হইতেও ভর্তুকি তোলার প্রস্তাব করা হইয়াছে। গতবার ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ১,২৩,৯৩৬.২৬ কোটি টাকা;এবার ভর্তুকি প্রায় ১২ শতাংশ কমাইয়া করা হইয়াছে ১,০৮,৬৬৬.৯০ কোটি টাকা। ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম এবং হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম নামক রাষ্ট্রায়ত্ত তৈল কোম্পানীগুলোকে এবার ভর্তুকি দেওয়া হইতে পারে ৩,১০৮ কোটি টাকা;গতবার যা ছিল ১৪,৯৫৪ কোটি টাকা। এই কোম্পানীগুলি সস্তা দরে কেরোসিন ও রান্নার গ্যাস সরবরাহ করিবার জন্যই এই ভর্তুকি পাইয়া থাকে। এই ভর্তুকি তুলিবার ফল কী মারাত্মক হইতে পারে অচিরেই তাহা জনগণ উপলব্ধি করিতে পারিবে। ইতিমধ্যেই পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যের উপর কাস্টম ডিউটি পাঁচ শতাংশ বাড়াইয়া দেওয়ায়, পেট্রোল ও ডিজেলের উপর সেন্ট্রাল এক্সাইজ ডিউটি বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে পেট্রোলের দাম রাতারাতি বৃদ্ধি পাইয়াছে এক টাকা প্রতি লিটার আর ডিজেলের দাম বাড়িয়াছে প্রতি লিটারে ২ টাকা ৭১ পয়সা। ভবিষ্যতে এই দর বাড়িয়া যে আকাশচুম্বি হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ ভর্তুকি প্রত্যাহার। সারের উপর ভর্তুকির পরিমাণ বর্তমানে ছিল ৫২,৯৮০.২৫ কোটি টাকা, আগামী বাজেটে অর্থাৎ '১০-'১১ বর্ষে এই ভর্তুকি কমাইয়া করা হইয়াছে ৪৯,৯৮০.৭৩ কোটি টাকা। গত সম্পাদকীয়তে কৃষিকে ধ্বংস করিবার যে ষড়যন্ত্রের কথা বলা হইয়াছিল, এইবারের বাজেটে তাহা সত্য প্রমাণিত হইল না কি? কৃষি উৎপাদনে এমনিতেই অনীহা দেখা দিয়াছিল কয়েক বৎসর ধরিয়াই। এইবার সারের ভর্তুকি তুলিয়া দিয়া কংগ্রেস সরকার কৃষির মৃত্যু ত্বরান্বিত করিবারই যে চেষ্টা করিতেছে তাহা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

অর্থমন্ত্রী বলিতেছেন পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ব্যয় কমানোই তাঁহার লক্ষ্য কারণ এই ক্ষেত্র অনুৎপাদক। তাহা হইলে সামাজিক ক্ষেত্র কি অনুৎপাদক নয়? এই সামাজিক ক্ষেত্রটিই হইতেছে নির্বাচনী রাজনীতি করিবার একমাত্র জায়গা। কৃষকদের ১০০ দিনের কাজ দিবার জন্য ৩৯,০০০ কোটি টাকা গত বাজেটে দেওয়া হইয়াছিল। তাহার আগের বাজেটেও দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতো একান্তই ছিল ভোট কুড়াইবার নিমিত্ত শাসকদলের কারসাজি। এই কারসাজি আবার গত তিনটি বাজেটে শুরু হইয়াছে সংখ্যালঘু অর্থাৎ মুসলমানদের উন্নয়নের নামে। যে খাতে ব্যয় বরাদ্দ শুরু হইয়াছিল প্রায় ৮৯০ কোটি দিয়া। এইবারের বাজেটের প্রস্তাব দাঁড়াইয়াছে তাহা ২৬০০ কোটি টাকায়। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী স্পষ্টই বলিয়াছেন যে এই অর্থ ব্যয় হইবে দেশের ৯০টি মুসলিম অধ্যুষিত জেলার উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য। কি ভয়ানক প্রস্তাব। বিজেপি যদি হিন্দু অধ্যুষিত জেলাগুলির জন্য এই অর্থ বাজেটে বরাদ্দ করিত, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও বামদলগুলি সহ সমস্ত তথাকথিত সেকুলার দলগুলি ভারতীয় সংসদকেই পাক-সংসদ বানাইয়া ফেলিত।

এইভাবে দেশের জেলাগুলির হিন্দু-মুসলিমে ভাগ করিবার সাম্প্রদায়িক দায় কিন্তু কংগ্রেসকেই লইতে হইবে। কারণ হিন্দু শক্তি আজ অনেক জাগ্রত ও সংহত এবং ঐক্যবদ্ধ।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

ভালই হউক বা মন্দই হউক, হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতে ধর্মই জীবনের চরম আদর্শ বলে পরিগণিত হইয়াছে; শতাব্দীর পর শতাব্দী দীপ্ত স্রোত প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, দেখিতেছি, ভারতাকাশ ধর্মতত্ত্বে সাধনায় পরিব্যাপ্ত, ভালই বলো আর মন্দই বলো আমাদের জীবনের আরম্ভ ও পরিণতি ওই সমস্ত ধর্মাধ্যক্ষের সাধন ক্ষেত্র। ফলে ওই সাধনা আমাদের রক্তে প্রবেশ করিয়াছে। প্রত্যেক রক্তবিন্দুর সহিত শিরায় শিরায় ইহা স্পন্দিত হইতেছে এবং আমাদের প্রকৃতির সহিত, জীবনীশক্তির সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। এই অন্তর্নিহিত বিপুল ধর্মশিক্ষাকে স্থানচ্যুত করিতে হইলে প্রতিক্রিয়ার কী গভীর শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে ভাবিয়া দেখ। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যে মহানদী নিজের খাত রচনা করিয়াছে উহা না বুজাইয়া ধর্মকে পরিত্যাগ করা চলে কী? তোমরা কী বলিতে চাও হিমতুষারালয়ে আবার ভাগীরথী ফিরিয়া যাইবে এবং পুনর্বার নতুন পথে প্রবাহিত হইবে? তাহাও যদি বা সম্ভব হয়—তবুও জানিও আমাদের দেশের পক্ষে পরমার্থ সাধনরূপ বিশেষ জীবন খাতটি পরিহার করা অসম্ভব এবং রাজনৈতিক বা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি রূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

রেল বাজেট ২০১০-১১

মমতা পরোক্ষে কংগ্রেসকে এরাজ্যে দশমিকে পরিণত করতে চাইছেন

তারক সাহা

এবারের রেল বাজেটে মমতার লক্ষ্য দুটি—এক, ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট তথা সিপিএম-কে সমূলে উৎপাটন, যা প্রায় অবশ্যম্ভাবী;দুই, এরাজ্যে কংগ্রেসকে দশমিকে পরিণত করা।

গত নির্বাচনগুলিতে দক্ষিণবঙ্গে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নিয়ে আন্দোলনে বুদ্ধ সরকারের সার্বিক ব্যর্থতায় উদ্বুদ্ধ মমতা এবারে নেমেছেন উত্তরবঙ্গে কংগ্রেসকে ঘাস-ফুলের জঙ্গলে মুড়ে ফেলতে। কয়েকটা প্রকল্প দেখলেই তা বোঝা যাবে। উত্তরবঙ্গে নতুন ট্রেন—আলিপুর-লামডিং ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, এন জি পি-চেন্নাই এক্সপ্রেস, আলুওয়াড়ি-শিলিগুড়ি-এন জে পি রেল ইত্যাদি। এরাজ্যে ঘোষিত মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতালের ১৩টির মধ্যে উত্তরবঙ্গেই চারটি—মালদা, নিউ ফারাক্কা, এন জে পি। এছাড়া ফারাক্কায় পানীয় জলের প্রকল্প। বর্ধমান বরাবরই সিপিএমের দুর্গ। সেই দুর্গে ফাটল ধরাতে ধরাতে বর্ধমানে মমতার ঘোষণা—চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানার আধুনিকীকরণ, বর্ধমানে ওয়াগন কারখানা ইত্যাদি কর্মমুখী পরিকল্পনা।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে মমতা সুরভি গাভীর মতো অকাতরে এত দুগ্ধ পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য বিলোচ্ছেন তার লক্ষ্য তো সেই ২০১১ সাল। যদি তা বাস্তবায়িত হয় তবে আমরা প্রায় এক বৎসর বাদেই মমতাকে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে দেখতে পাব। এর মধ্যে মাত্র আরেকটা বাজেট পাব মমতার। তারপর কি হবে? এই সময়কালে মমতার অবস্থান দুটো হবে। এক, নিজে মুখ্যমন্ত্রী না হয়ে অনুগত কোনও সৈনিককে উনি মুখ্যমন্ত্রী করবেন, যাঁর ওপর সোনিয়ার মতো নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং নিজে রেলমন্ত্রী থাকবেন, দুই নিজে সি এম হয়ে অনুগত কাউকে রেলমন্ত্রী পদে বসিয়ে কলকাতা থেকে কলকাঠি নাড়বেন।

এই দুটি সম্ভাবনা নিয়ে ইতিমধ্যে জল্পনা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। আসলে এদেশে কোনও সাড়া পেতে গেলে উৎকোচ দিতে হয়। মমতা সেই সরকারী ঠিকাদারদের মতো রাজ্যবাসীদের উৎকোচ দিয়ে ক্ষমতা দখলের কাজ শুরু করেছেন। সবাই প্রশ্ন তুলছেন, মমতার সাধ আছে, সাধ্য কোথায়? মমতা যেভাবে রেল বহির্ভূত ক্ষেত্রে বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন তাতে তো আগামীদিনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে কয়েকটা পদ তুলে দিতে হবে। যেমন রেলের জমিতে হাসপাতাল, স্কুল-কলেজের গঠনের কথা ঘোষণা করে কার্যত কপিল সিবালকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন। পরমাণু প্রকল্প ছাড়া মোটামুটি সব দপ্তরেই হস্তক্ষেপ করেছেন মমতা।

দ্বিতীয় কথা হলো, বাংলাদেশে অতিরিক্ত ট্রেন চালাবার কথা ঘোষণা করে মমতা মুসলীম তোষণের ক্ষেত্রে আরেক কদম এগোলেন। শুধু তাই নয়, এই ঘোষণা বাস্তবায়িত হলে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা অবধারিতভাবে বাড়বে দেশ তথা এরাজ্যে।

মমতার এত ঘোষণা কিন্তু তার জন্য পয়সা কই? গত বছরে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে জোর দেওয়া হলেও বিশ্বের সর্ববৃহৎ ট্রান্সপোর্ট নেট ওয়ার্কের জন্য এবারে ওই বিষয়ে অনুদান মাত্র ১৩০২ কোটি টাকা। এ বছরে কুয়াশাজনিত দুর্ঘটনায় বহু যাত্রী মারা গেলেও অর্থ সংস্থান নেই ওই ক্ষেত্রে। গত বছর রেলের উদ্যোগে আদ্রায় বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ার ঘোষণা থাকলেও সমীক্ষা ছাড়া এক কদমও এগোয় নি কাজ। এগোয় নি কাঁচড়াপাড়া রেল কোচ কারখানার কাজও।

গত এক বছরে মমতার উল্লেখযোগ্য অবদান হলো নতুন নতুন কিছু ট্রেন চালানো। অভিজ্ঞদের মত, ট্র্যাক সংস্কার ছাড়া বাতিল কোচ দিয়ে নতুন ট্রেন চালানোর ঝুঁকি নিচ্ছেন স্রেফ সস্তা জনপ্রিয়তার জেরে।

বাধ্যতা থাকলেও এবারেও রেল ভাড়া বাড়ালেন না মমতা। এরাজ্যে ভাড়া না বাড়িয়ে সিপিএমের পালের হাওয়া তো কাড়লেনই, উল্টে মাগ্গীর বাজারে জিনিসপত্তের দাম যাতে কমে তার জন্য খাদ্যশস্য, কেরোসিনের মতো অপরিহার্য সামগ্রীর পরিবহন খরচা ওয়াগন পিছু একশো টাকা কমালেন।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন নিয়ে শিল্পবিরোধী হিসাবে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে মমতাকে। তাই বাজেটের আগে রেলকে অনেকটাই বেসরকারী-করণের পথে হাঁটতে শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। শিল্পপতিরা অবশ্য লাভের কড়ি মোটা না হলে সরকারের সঙ্গে হাত মেলাবেন কিনা সন্দেহ। আগামীদিনে রেল রিজার্ভেশন, রেল লাইন পাতার কাজ বেসরকারী হাতে যাবে এমন ইঙ্গিত মিলছে। অতীতে সড়ক পরিবহণের খরচা রেল পরিবহণের খরচা থেকে কম হওয়ায় রেলে পণ্য পরিবহণ, যাত্রী পরিবহণ বেশ কমে গেছিল। লালু রেলকে পথ দেখিয়েছেন রেল পরিবহণে মাশুল না বাড়িয়ে বরং অধিকমাত্রায় পণ্য-যাত্রী পরিবহণ করতে পারলে প্রতিযোগিতায় জমানায় রেলের আয় বেশী হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ভাড়া কম হলে যাত্রীরাও অধিকমাত্রায় টিকিট কেটে যাতায়াত করবে।

গতবারের মতো এবারেও সোনিয়ার অঙ্গুলিহেলনে মনমোহন মমতার পিঠ চাপড়েছেন। অতীতে কেন্দ্রে সিপিএমকে লেজুড় বানিয়ে অনেক ঝক্কি পোহাতে হয়েছে তাঁকে। শরীরের সঙ্গে লেজের অসহযোগিতায় পরমাণু চুক্তি নিয়ে প্রায় গদি হারাতে বসেছিলো কংগ্রেস। মুলায়ম এগিয়ে না এলে ২০০৮-এ অকাল নির্বাচন হোত। কিন্তু সেটা হয়নি। ২০০৮-র বেইমানির যোগ্য জবাব কংগ্রেস সিপিএমকে দিতে চাইছেন ২০১১-এ মমতার হাত ধরে। সোনিয়া বিলক্ষণ জানেন রাজ্য কংগ্রেসে যেসব নেতারা রয়েছেন তাঁরা সবাই ষাটোর্দ্ধ। কংগ্রেস নবীন প্রজন্ম আসা প্রায় বন্ধ। সিপিএমের বিরুদ্ধে জোয়ারে তরুণরা এবারে স্বার্থের ধান্ধায় তৃণমূলের দরজায়। তাই সর্বস্তরে নেতাদের সোনিয়ার নির্দেশ—মমতার হাত শক্ত করো। মনমোহনও সেই নির্দেশেরই তল্পিবাহক। কারণ এবারের অধিবেশনেও সোনিয়া দেখেছেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে সংসদ সরগরম এবং এই ব্যাপারে ফ্লোর-কো-অর্ডিনেশনে সব বিরোধীরা এককাট্টা। জোটধর্মের তাগিদে শারদ পাওয়ারকে নিয়ে একসঙ্গে চলতে হচ্ছে বটে, কিন্তু পছদের তালিকায় শারদের চেয়ে মমতা অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য। তাই মমতার হাত শক্ত করে নিজের অবস্থানকে আরও পোক্ত করতে চাইছেন সোনিয়া।

তাছাড়া আম-আদমি দেখতে চায় কটা নতুন ট্রেন হলো। তা দিয়ে অনেক হাততালি কুড়োন যায়। মানুষের স্মৃতি খুবই স্বল্পমেয়াদি। কাঁচড়াপাড়ায় রেল কারখানা হলো কিনা, আদ্রায় রেলের বিদ্যুৎ প্রকল্প হলো কিনা এমনসব পরিকল্পনা কল্পনাতেই আচ্ছন্ন থাকুক। মমতা এ রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হলে তাঁর ঘোষণা কতটা বাস্তবায়িত হলো আর কতটাই বা বাস্তবায়িত হলো না—এমনসব বেয়াড়া হিসেব-নিকেশ কোনওদিনই মানুষ চাইবে না মমতার কাছে। নতুন রেলমন্ত্রীর আবার নতুন নতুন ঘোষণা, নতুন নতুন গিমিক চলতেই থাকবে। ভোট চাই, ক্ষমতা চাই—আজকের রাজনীতিকদের মন্ত্র। কারণ ভোট যে বড় বালাই।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন নিয়ে শিল্পবিরোধী হিসাবে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে মমতাকে। তাই বাজেটের আগে রেলকে অনেকটাই বেসরকারী -করণের পথে হাঁটতে শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

মুসলিম সংরক্ষণ

(১ পাতার পর)

সাচার কমিটি, রঙ্গনাথ মিশ্র কমিটি ইত্যাদি সব হয়েছে। নানারকম রিপোর্ট বেরিয়েছে। জানা গেছে ওই সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি। তখন থেকে ভোট ভিক্ষু ব্যবসায়ীরা ভাবলেন যে এদের জন্য সংরক্ষণ করে দিলেই এদের উন্নতি হয়ে যাবে। একবার কেউ ভাবলেন না যে গরীব কি শুধু মুসলমানদের মধ্যেই? অমুসলমান বা আরও সহজ কথায় হিন্দুদের মধ্যে গরীব নেই? একই দেশের নাগরিক দু'জন। একজন সংরক্ষণের আওতায় কেবল মুসলমান বলে? আর একজন সংরক্ষণের বাইরে কেবল হিন্দু বলে? তাহলে গরীব হিন্দু হওয়া কি অপরাধ? গরীব মুসলমানরা পুণ্যবান আর গরীব হিন্দুরা পাপী? স্বাভাবিক ভাবেই সিদ্ধান্ত হয় এই যে যদি গরীবদের উন্নতির জন্য সংরক্ষণ করতে হয় তাহলে যে কোনও ধর্মবিশ্বাসী গরীবদের জন্যই সংরক্ষণ হওয়া উচিত। অর্থাৎ সংরক্ষণের ভিত্তি হবে আর্থিক অবস্থার মাপকাঠি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই রাজ্যে মুসলমানদের জন্য চাকুরী ও শিক্ষালয়ে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ঘোষণা করেছেন। তবে সব মুসলমানের জন্য নয়। যে মুসলমানের আয় বছরে সাড়ে ৪ লক্ষ টাকার কম। সাড়ে চার লক্ষকে ১২ দিয়ে ভাগ করলে দাঁড়ায় ৩৭৫০০ টাকা। তাহলে যে মুসলমানরা মাসে ৩৭৪৯৯ টাকা রোজগার করেন তারা সংরক্ষণ পাওয়ার অধিকারী। অবসরপ্রাপ্ত কোনও মুসলমান অধ্যাপক, শিক্ষক, সরকারী বড় অফিসার, কোনও সরকারী ডাক্তার এত টাকা পেনসন পান? পান না। তাহলে সেই মুসলমান ভদ্রলোকরাও সংরক্ষণের আওতায় চলে আসবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার কোনও বাস্তব সম্মত অর্থ দাঁড়ালো? এরা ক্ষমতায় আছেন, এরকম বলছেন। যারা ক্ষমতায় আসতে চাইছেন তারাও বলছেন যে তারা ক্ষমতায় আসলে রঙ্গনাথ মিশ্র কমিটির সব সুপারিশ মেনে নেবেন। এটাও বাস্তবসম্মত নয়। তবু এরা বলছেন। কেন বলছেন? থোক ভোটের জন্য। ক্ষমতায় থাকতে গেলে থোক ভোট চাই। মুসলমান সম্প্রদায় খুব গুরু মেনে চলেন, তাদের থোক ভোট আছে, তাদের কাছে সবার বড় ইসলাম, ধর্মগুরুরা বললে তারা তা মান্য করেন। অতএব এসো থোক ভোট পাওয়ার প্রতিযোগিতায় লেগে পড়ি। নিলামে তুলে দিলাম—মুসলমান সমাজের উন্নতি—এবারে 'ডাক' হবে কে কত সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিলামের মাল কিনতে পারে। চুলোয় যাক অমুসলমান, চুলোয় যাক হিন্দু। ওরা ঘরকা মুরগী। ওদের থোক ভোট নেই অতএব নির্বাচনে ওদের গুরুত্বও নেই। এবার যদি কেউ হিন্দু স্বার্থের কথা বলে আমরা যারা নিলাম ডাকতে গেছি—আমরা সবাই বলব—ওটা সাম্প্রদায়িক। দশচক্রে ভগবানও ভুত হয়। ওই ভুত হওয়ার ভয়ে কেউ আর অমুসলমান বা হিন্দু স্বার্থের কথা বলতে পারবে না। ভারতীয় সংবিধানেই ধর্ম বা সম্প্রদায় ভিত্তিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার মুসলমানদের জন্য ৪ শতাংশ সংরক্ষণ করেছিল। অন্ধ্র হাইকোর্টের ৭ বিচারকের বেঞ্চ ওই সংরক্ষণ নাকোচ করেছেন। মুসলমানদের খুশী করতে সরকার বলেছেন যে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করবেন। বিভিন্ন দলের মুসলিম নেতারা যে এসব ধাপ্পা বোঝেন না তা নয়। তারাও বোঝেন। কিন্তু মুসলমান স্বার্থর ব্যাপারে তাদের সব দলের নেতারাই এক এবং অভিন্ন। সেখানে হাসিম আবদুল হালিম, গোলাম নবী আজাদ আর সুলতান আহমেদ সমমতাবলম্বী। তাই মুসলমান স্বার্থকে নিলামে তুলতে তাদের আপত্তি নাই। দিক না সুযোগ সুবিধা। যে-ই দিক তাতো আমার কৌম-এর লোক পাবে। আমি আপত্তি করে ইসলাম নীতি খুল্লু মুসলেমিন ইখুয়াতুন এর বিরোধে যাব কেন?

খুল্লু মুসলেমিন ইখুয়াতুন।

মুসলমান ধর্মগুরুরা মুসলমান সমাজের উন্নতিতে কতটা উৎসাহী তা নিয়ে আমার নিজের সন্দেহ আছে। উৎসাহ থাকলে তারা দেখতে পেতেন ঐস্লামিক দেশগুলি কীভাবে তাদের দেশের মুসলমান জনগণের উন্নতি ঘটাচ্ছেন। কেন সে দেশগুলি জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে, কেন তারা কোরাণ-হাদিস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার থেকে বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা মেনে নিয়েছে। যে কোনও সমাজেই আর্থিক উন্নতির জন্য তিনটি অবশ্য পালনীয় কাজ আছে—

(১) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত রাখা—তার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা। (২) বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। (৩) গোষ্ঠী ক্রোধ ও উগ্রতাকে ব্যবহার না করে যুক্তিবাদী হওয়া।

আদিবাসী, তপশীল, মুসলমান ওবিসি যে সমাজেরই উন্নতি চান—এই তিনটি নীতি প্রয়োগ করুন—উন্নতি হবে। এই ব্যবস্থা সুবিধা বন্টন করে থোক ভোট সংগ্রহের রাজনীতি নয়। সমাজ উন্নয়নের স্বাভাবিক নীতি।

পাকিস্তানে দোষ নেই

(২ পাতার পর)

আদালতে কি অভিযোগ আছে তা দেখার দায়িত্ব আমার নয়।' যেমন এযাবৎ যে সব সিনেমায় শাহরুখ অভিনয় করেছেন সেসব সিনেমায় প্রযোজকরা কোন্ উৎস থেকে টাকা যোগাড় করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে দেশের কোনও আদালতে কোনও অভিযোগ আছে কিনা—সেসব বিষয়ে শাহরুখ কোনও প্রশ্ন তুলেছিলেন বলে শোনা যায়নি। কিন্তু টোডি পরিবারের ব্যবসার বিজ্ঞাপন থেকে তিনি সরে গেলেন—'প্রতিবাদ' ওঠামাত্র। এভাবেই বোধহয় তিনি প্রমাণ করলেন—'মাই নেম ইজ্ খান।'

নানুরে আক্রান্ত হিন্দু গ্রাম

(১ পাতার পর)

কারণ, রাজনৈতিক মদতে নানুর দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। মাসকেট বাহিনীর দাপটে দিশেহারা প্রশাসন। কারণ মাসকেট বাহিনীর অঙ্গুলি হেলনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে নানুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। একদা সিপিএমের শক্ত ঘাঁটি নানুর। রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে এই লাল দুর্গেও ফাটল ধরেছে। ফলে ক্ষমতা হারাচ্ছে শাসক দল। এমনই অবস্থায় হারানো জমি ফিরে পেতে সন্ত্রাস করে এলাকা দখলে নামছে সিপিএম। তাদের প্রতিহত করতে তৃণমূল শিবিরে আশ্রয় নেওয়া স্থানীয় মাসকেট-বাহিনীকে কাজে লাগাচ্ছে। অথচ পুলিশ প্রশাসনের কাছে সমস্ত তথ্য থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। মুসলিম দুষ্কৃতীরা নানুরকে দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে পরিণত করেছে। গ্রামে পুলিশ ঢোকা তো দূরের কথা বহিরাগত সাধারণ মানুষও ঢুকতে পারে না। এইসব গ্রামগুলিতে প্রকাশ্যে বাড়ির বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলেই বোমা বানায়, বাইরে থেকে আসা বেআইনী অস্ত্র মজুত করে ব্যবসা করা হয়।

বর্তমানে রাজনৈতিক পরিবর্তনের হাওয়া লাগতেই দুষ্কৃতীরা শাসকদলের শিবির ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ঝুঁকছে বিরোধী দলের দিকে। এমত অবস্থায় নানুর এলাকার রাজনৈতিক অঙ্ক পুরোপুরি নির্ভর করে দুষ্কৃতীদের হাতে।

এই বিষয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি অরুণাভ ঘোষ বলেন, সমাজবিরোধীদের মদত দিয়েই সিপিএম এতদিন স্বার্থ চরিতার্থ করত। এখন তাদের শিবির ছেড়ে দুষ্কৃতীরা তৃণমূল শিবিরে আশ্রয় নিয়ে সন্ত্রাস করছে। পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা এক্ষেত্রে খুবই লজ্জাজনক।

বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার রবীন্দ্রনাথ মুখার্জী জানিয়েছেন, নানুর এলাকার রাজনৈতিক সংঘর্ষ স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকের হাতেই অস্ত্র মজুত থাকার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। আমরা অস্ত্র উদ্ধারে নামছি।

মন্ত্রিসভার শরিক, সিদ্ধান্তের নন

(১ পাতার পর)

তৃণমূল ও কংগ্রেস দলের জোট আছে। কীভাবে মমতা জনরোষ সামাল দেন সেটাই দেখার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে সদলবলে পদত্যাগ করে বেরিয়ে এলে যে চিঁড়ে ভিজবে না সে' কথা আগাম বলে দেওয়া যায়। বহু ব্যবহারে পদত্যাগের অস্ত্র এখন ভোঁতা হয়ে গেছে।

মমতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তিনি পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব রুখে দেবেন। বাস্তবে যে দিন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবটি মন্ত্রিসভার বিশেষ জরুরী বৈঠকে আলোচিত হয় সেই বৈঠকে মমতা অনুপস্থিত রইলেন। যুক্তি দেওয়া হলো যে অবহেলিত বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলে রেল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার শিলান্যাসে ব্যস্ত ছিলেন। মমতা জানতেন তাঁকে উপেক্ষা করেই পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ানো হচ্ছে। দিল্লিতে তিনি তাঁর রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের নিয়ে একাধিক গোপন বৈঠক করেছেন। এখানেই ঠিক হয় যে মূল্যবৃদ্ধিকে ইস্যু করে সিপিএম ঝাঁপাবার আগেই তৃণমূল প্রতিবাদে পথে নামবে। ভোটের গরজ বড় বালাই। তবে পাবলিক চালাকিটা ধরে ফেলেছে। মমতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যা। কিন্তু মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত মানেন না। আমাদের সংবিধান এমন স্বাধীনতা মন্ত্রিদের দেয়নি। বলা হয়েছে, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত যৌথ এবং তা সকল মন্ত্রীকেই মানতে হবে। তা তিনি অনুপস্থিত থাকুন অথবা মন্ত্রিসভার বৈঠকে মৌখিকভাবে আপত্তি জানান। তবে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভিন্ন মত হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী পদত্যাগ করে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদ জানাতে পারেন। একদা জওহরলাল নেহরু কাশ্মীরকে পৃথক দেখাতে সেখানের জন্য ''স্পেশাল স্ট্যাটাস'' ঘোষণা করতে চেয়ে একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এনে ছিলেন। ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। পরে এর জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেন।

মমতা ভোটের রাজনীতি করছেন। তিনি মন্ত্রিসভায় আছেন। কিন্তু মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের শরিক নন। তিনি তাঁর জোট সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজপথে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন। আবার সেই সরকারের মন্ত্রী হিসাবে লোকসভায় ট্রেজারি বেঞ্চে বসবেন। বাজেট প্রস্তাবের উপর বিতর্কে অর্থমন্ত্রীকে জোরদার সমর্থন জানাবেন। এটি স্পষ্ট দ্বিচারিতা। মমতা এক সময় কেন্দ্রে কংগ্রেস-সিপিএমের বন্ধুত্ব নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলতেন, 'দিল্লিতে দোস্তি, এখানে কুস্তি'। এখন যদি মমতাকে ঠিক একই কথা সিপিএম বলে তবে কী ভুল বলা হবে?

দর কষাকষি

(১ পাতার পর)

তার কোনও প্রভাব বুঝতে পারছে না। অনেকেই বলছেন, আগে পকেটে করে টাকা নিয়ে গিয়ে থলি ভরতি বাজার করে আনা যেত। এখন থলি ভরতি টাকা নিয়ে গেলে পকেট ভরতি বাজার আসে। অথচ সরকার নির্বিকার। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পেশ করা বাজেটে ডিজেলের উপর কর বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। যাতে সর্বস্তরে মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আয়কর ছাড়ের যে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে তাও হাস্যকর। ৫ লক্ষ টাকা বা তার বেশি আয়ের রোজগেরেদের আয়কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। সমাজের কত শতাংশ মানুষ এই মাপের আয় করতে সমর্থ হন? দাম বাড়ছে কোর সেক্টর অর্থাৎ স্টিল এবং সিমেন্টের। ফলে অপ্রত্যক্ষভাবে সবক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি বেড়ে যাবে। অথচ দেশের খাদ্য-মন্ত্রী শারদ পাওয়ার কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে উলটে বলেছেন, আরও দু'বছর বাজারের পরিস্থিতি একই থাকবে। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম সরকারও মূল্যবৃদ্ধি রোধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি। মজুতদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা, আলু, পেঁয়াজের দাম কমানোর বদলে হিমঘর মালিকদের সুবিধা করে দিয়েছেন। অবাধে বাংলাদেশে চাল চলে যাচ্ছে। আটকানোর হিম্মত নেই। রাজ্যে ডাল শস্য, ধানের উৎপাদন বাড়ানোর মতো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তো দূরের কথা, স্বল্পমেয়াদি কোনও ব্যবস্থা নিতেও ব্যর্থ হয়েছে। একই নাটক মমতা ব্যানার্জীরও। এন ডি এ আমলে গ্যাসের দাম বাড়ানো নিয়ে অনেক কাণ্ড করেছিলেন তিনি, এখন কিন্তু চুপ।

রাজ্য রাজনীতি

বুদ্ধের অধীনে কাজ করতে নারাজ পুলিশ প্রশাসন

নিশাকর সোম

শিলদার ঘটনার পর দেখা গেল—পুলিশ কর্তা স্বরাষ্ট্রসচিবের মধ্যে মতদ্বৈধতা। আজকে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের মধ্যে এক চরম বিশৃঙ্খলা। কারণ কি? কারণটা হচ্ছে পুলিশ বাহিনীকে রাজনীতির অধীনে আনা। জ্যোতিবাবুর আমলেই লালবাজারের পুলিশের সদর দপ্তরে পুলিশ-কর্মীদের সভায় জ্যোতি বসু বলেছিলেন "আমাদের আপনারা অতীতে জিতিয়েছেন, এবারও জেতান।" মহাজনের সেইপথ ধরে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুও লালবাজারে সভা করে একই কথা বলেছিলেন। আগের দিনে পুলিশকে চালাতো আই পি এস অফিসাররা। আর এখন চালায় সিপিএম-এর ডি সি এস (জেলা সম্পাদক) জোনাল সিএস-লোকাল সিএস। এরফলে পুলিশ বাহিনী বুঝে গেল চাকরী বাঁচাতে দরকার সিপিএমকে খুশী করা। আর এর এক নেতিবাচক প্রভাব পড়ল সিপিএম-দলে। তা'হলো "আমাদের ক্ষমতা মাভৈঃ; যা খুশী কর—আমরা আছি, খালি যেনতেন প্রকারেণ ভোটে জেতাও।" আর এক নগ্ন দিক দেখা গেল পুলিশ কমিশনারকে জেতানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুর কি নির্লজ্জ ওকালতি! পুলিশকে যদি অনুশাসনে আনতে হয় তবে প্রথমেই তাঁদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার বন্ধ করতে হবে। ক্লাব, রিক্রিয়েশন ক্লাব, ইত্যাদি সাংস্কৃতিক, সামাজিক সংস্থা করতে বলতে হবে। পুলিশকে সোজা-সাপটা বলে দিতে হবে—"পুলিশের কাজ মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়া-রাজ্যকে নিরাপদে রাখা, কোনও দলের 'দল-দাস' না-হওয়া।"

এদিকে মাওবাদীরা কিশোর-শিশুদের তাদের অ্যাকশান স্কোয়াডে এনে হত্যাকাণ্ডের কাজে লাগাচ্ছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে দেখা গেছে—জোর করে জনজাতিদের বাড়ি থেকে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের জোর করে জঙ্গিবাহিনীতে আনা হচ্ছে। এসম্পর্কে প্রতিবাদ উঠছে। সংবাদপত্রে দেখা গেছে জনসাধারণের কমিটির সদস্যদের সন্তানদের জোর করে বাহিনীতে ভর্তির বিরুদ্ধে ও মতপ্রকাশ করা হচ্ছে। মাওবাদীদের পক্ষ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করা হচ্ছে—প্রত্যেক শিক্ষককে মাসিক ৫০০ টাকা দিতে বাধ্য করছে মাওবাদীরা। তারা ফরমান জারি করেছেন—জনসাধারণের কমিটি ছাড়া কোনও সংগঠনের তাদের অধীনস্থ এলাকায় কাজ করা চলবে না। এককথায় মাওবাদীরা হিটলারি কায়দায় চলেছে। এ-সম্পর্কে কোনও প্রতিবাদ প্রচার কোথায়? ভয়ে কি চুপচাপ? আসলে আদিবাসীদের স্বার্থ অথবা উন্নতির কোনও কর্মসূচী কোনও পক্ষ থেকেই সক্রিয় ভাবে করা হচ্ছে না। আদিবাসীদের

রাজনৈতিক দাবা খেলার বড়ে করা হয়েছে। এই মাওবাদী হামলার মোকাবিলার অজুহাতে জেলায় জেলায় সিপিএম-নেতাদের নিরাপত্তা দেওয়ার নামে কার্যত জেলা পুলিশ- প্রশাসনকে সিপিএম-এর জেলা নেতাদের আজ্ঞাবহ করে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের পোস্টিং সিপিএম-এর রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা ঠিক করেন। যেমন যেমন জেলা নেতারা পার্টির সুবিধার জন্য বলেন তেমন তেমন পোস্টিং হয়। ফলে পুলিশ-এর এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে—জেলা নেতাকে খুশী রাখতে পারলেই তাঁর ভবিষ্যত উজ্জ্বল হবে। এ-ব্যাপারে নাকি উত্তর ২৪ পরগণার পরাজিত সাংসদ অমিতাভ নন্দী সব থেকে এগিয়ে আছেন। তিনি বামফ্রন্টের শুরু থেকেই তাঁর বাড়িতে এস-পি/ডি এস পি-দের আসাটা নিশ্চিত করেছিলেন। সিপিএম-এর কপালে দুঃখ আছে—২০১১-এরপর যদি এর উল্টোটা হতে থাকে? সম্প্রতি ঘটনায় প্রকাশ, শিলদার অরক্ষিত স্থানে ই আর এফ-এর তাঁবু নাকি সিপিএম-নেতাদের আদেশ অনুসারে করা হয়েছিল? এখানকার হত্যাকাণ্ডের ফলে পুলিশের মধ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এখন এই অঞ্চলের পুলিশ কর্তাদের ব্যাপকভাবে বদলি করে দিয়ে চমক দেওয়ার চেষ্টা চলছে। পুলিশমন্ত্রী হিসাবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ব্যর্থ। কিন্তু বিকল্প নেই। তাই ২০১১-এর বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত এই অবস্থা চলবেই। আর ২০১১ পর্যন্ত কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কেন্দ্রে ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসকে তৃণমূল নেত্রীর অধীনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন যদি লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন হয় তাহলে এন-ডি-এ তথা বিজেপি-র ক্ষমতায় চলে আসার সম্ভাবনা! কেন্দ্রে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার জন্যই মমতার "আবদার" মেনে নিতে হচ্ছে। দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে দু'দিন মমতা কেঁদে ফেলেছেন। নারীর অশ্রুতে সব পৌরুষই ভিজে যায়। যেমন নারীর কথায় ও কাঁদুনিতে কমিউনিস্ট তথা সিপিএম একাধিক নেতাকে মোটিভ বিচার না করে বহিষ্কার করে দেয়।

জ্যোতি বসু পুলিশকে দিয়ে অনেক "ঘৃণ্য" কাজ করিয়েছিলেন। তিনি তাঁর দলের ভিতরে এবং রামফ্রন্টের অন্যান্য দলের মধ্যে "পুলিশের ইনফরমার"-এর তালিকা তদানীন্তন ডি আই জি (আই বি) রণজিৎ গুপ্তের নিকট থেকে নিয়েছিলেন। তদানুযায়ী আর সি পি আই-এর নেতা ও তখনকার বিধায়ক মকসেদ আলিকে তাঁদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করিয়ে ওই কেন্দ্রে আর সিপিআই নেতা সুধীন কুমারকে বিধায়ক নির্বাচিত করা হয়। শোনা যায় জ্যোতি বাবুর প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী সিপিএম-এর মধ্যেও "উইচ হ্যান্টিং" ছভ্রন্দ্ধন্তুড়ড়ন্তুঙ্দ্ধন্ন্ধঙ্ক শুরু হয়? গোয়েন্দারাও নেতাদের মন বুঝে এই তালিকা দিতে থাকে।

সিপিএম-এর সদ্য সমাপ্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সভা থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বরদারাজন-কে বহিষ্কার করা হয়—পরে বরদারাজন চিঠি লিখে নিখোঁজ হন। এরপর তাঁর মৃতদেহ গলিত অবস্থায় একটি হ্রদ থেকে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন উঠেছে "কমিউনিস্ট"দের আত্মহত্যা কেন? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের আত্মহত্যার মাত্র দু'টি ঘটনা জানাই—(১) রুশ কবি মায়াকোভাস্কি আত্মহত্যা করেন, (২) লেখক ফাদায়েভ আত্মহত্যা করেন এবং সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় দপ্তরের কর্মী দেশরাজ চাড্ডা পাখাতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছিলেন। মন্ত্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলী গায়ে মদ ঢেলে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এস ইউ সি কর্মী বিধান চ্যাটার্জি এস ইউ সি নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন—নীট ফল বিধান চ্যাটার্জির আত্মহত্যা। কংগ্রেসের এককালের ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী চিত্রা ব্যানার্জি নিজের ঘরে অন্যের "ত্রুটি"তে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান! অতীতে বহরমপুরের পার্টি অফিসে গলায় নতুন কাপড়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন নিতাই গুপ্ত নামে এক আর এস পি কর্মী। নিতাইবাবু গোয়াতে কারাগারে আর এস পি নেতা ত্রিদিব চৌধুরীর সঙ্গে কারাবাস করেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টিতে নেতৃত্ব থেকে সরানোর জন্য মহিলা দিয়ে অভিযোগ দায়ের করান হয় এবং দূর করে দেওয়া হয় কর্মী-নেতাদের।

কমিউনিস্টদের নীতি-নৈতিকতার বড়াই দেখে কৌতুক অনুভব করতে হয়। কারণ কার্ল মার্কস তাঁর পরিচারিকার সঙ্গে সহবাস করেছিলেন। ফলে একটি সন্তান হয়। এই সন্তানের কারণে মার্কসের বদনাম হবে ভেবে বন্ধু এঙ্গেলস এই সন্তানকে তাঁর সন্তান বলে চালিয়ে দেন শুধুমাত্র বন্ধু-বাৎসল্যের জন্য। সম্প্রতি এঙ্গেলস সম্পর্কে একটি প্রকাশিত বইতে এই তথ্য পাওয়া গেছে। লেনিন তো কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অফিসের জনৈকা (নিনা?) সঙ্গে প্রেমে লিপ্ত ছিলেন বলে পুস্তকে পড়া যায়। খ্রুশ্চভ আর মাদাম ফুর্ৎসেভা নিয়ে গল্পতো এ রাজ্যের কমিউনিস্টরাই চালু করেছিলেন। এ-দেশের এমনকী এই বঙ্গের কমিউনিস্টদের কিছু কীর্তির কথা জানাই—(১) সৎমাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করা। (২) কাকিমা-কে বিয়ে করা। (৩) বৌদিকে বিয়ে করার একাধিক ঘটনা আছে। (৪) মাসতুতো/মামাতো/ খুড়তোতো বোনকে বিবাহ করা। (৫) বহু বিপ্লবী পরস্ত্রীকে নিজের স্ত্রীতে পরিণত করেছিলেন। —এতো রিপুর তাড়না। তাই কমিউনিস্টদের মুখে শুদ্ধিকরণটা একটা চালবাজি ছাড়া কিছু নয়। আপনি আচরি ধর্ম, অপরে শিখাও।

অ ঢ় রকম

মেটিরিয়া মেডিকার কাব্য

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এক স্থূলকায় তরুণী তার বাবা-মায়ের হাত ধরে উপস্থিত এক অশীতিপর ডাক্তারের বাড়িতে। তবে ডাক্তারবাবুটিকে ধন্বন্তরী বলা হলেও, রোগী-টোগি বড় একটা দেখেন না। কারণ তিনি ব্যস্ত রাজনীতিতে। পশ্চিমবঙ্গের মতো সদ্য ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত উদ্বাস্তু সমস্যাকবলিত একটি রাজ্যের যাবতীয়

কষ্ট ছাড়াই কেষ্ট প্রাপ্তি ঃ গুডে তেজস্বিনী।

প্রশাসনিক দায়ভার যে তাঁরই ঘাড়ে! মেয়েটির বাবা-মায়ে কেঁদে পড়লেন তাঁর পায়ে—"আমার মেয়েটাকে বাঁচান, ও দিন দিন এতই মোটা হয়ে যাচ্ছে যে ডাক্তার বলেছে আর বাঁচবে না।" সেই বাবা-মাকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং আক্ষরিক অর্থেই ধন্বন্তরী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মন্তব্য করলেন—'ঠিকই বলেছে ডাক্তারটি।' বিধান রায়ের কথা বলে কথা! মনের দুঃখে নাওয়া-খাওয়াই ছেড়ে দিল মেয়েটি। রোগা হতে বেশি সময় লাগল না তার। যা শোনার পর বিধান রায় বলেছিলেন—কেমন দিলাম? এযাত্রা তো অন্তত বেঁচে গেল মেয়েটা।

কিংবদন্তী চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায় সম্পর্কে বহু প্রবাদ প্রচলিত ছিল। উপরোক্ত ঘটনাটি সত্যি হলেও হতে পারে, প্রবাদও হতে পারে। যাই হোক না কেন, বিধানচন্দ্র রায় আজ বেঁচে থাকলে বোধহয় সবচেয়ে সুখী মানুষ হতেন। বাফেলো, হার্ভার্ড কিংবা সানি অথবা নিদেনপক্ষে বিলেত—চিকিৎসাবিদ্যায় তারা যতই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করুক না কেন, মারণরোগ ক্যান্সারের ক্ষেত্রে অন্তত ভারতবর্ষ জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবার জন্য কয়েক কদম এগিয়ে রয়েছে। না, ক্যান্সার নিয়ে কোনও যুগান্তকারী আবিষ্কার ভারতবর্ষে হয়নি। যেটা হয়েছে, সেটাকে নিটোল চিকিৎসা-পদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যে চিকিৎসা-পদ্ধতি বহুবার উপভোগ করেছে পাশ্চাত্যের দেশগুলি। কিন্তু এবার পালা প্রাচ্যের। শুনুন সেই রূপকথা, থুড়ি সত্যি কথাটা।

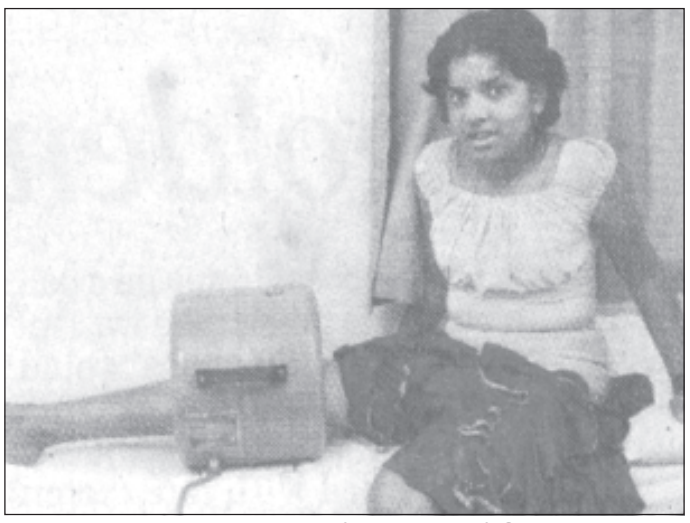

১২ বছর বয়সী বালিকা দিল্লীনিবাসী গুডে তেজস্বিনী বোন-ক্যান্সারে (হাড়ের ক্যান্সার) আক্রান্ত হয়ে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ভর্তি হন মুম্বাই-এর পি ডি হিন্দুজা হাসপাতালে। মেয়েটির বাড়ের মুখে ক্যান্সার আক্রান্ত পা-টির কষ্টসাধ্য অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তোলা নিয়ে বেশ কিছুটা সংশয়ে ছিলেন তার বাবা-মা। কিন্তু মাত্র ২৬ মিনিটের মামলা, আর তাতেই ক্ষতে প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবুরা। ১৬ মিনিটে ৪ মিমি বৃদ্ধি পেল তেজস্বিনীর ডান পা। এবং এর জন্য প্রয়োজন হয়নি কোনও অস্ত্রোপচারের।

প্রসঙ্গত, এই ক্যান্সারের নাম অস্টিওসারকোমা। তেজস্বিনীর চিকিৎসক অর্থোপেডিক অঙ্কোলজিস্ট (ক্যান্সার চিকিৎসক) মনীশ আগরওয়াল বলছেন, এই ক্যান্সার-এর বিশেষত্ব এটি হাড়ের বৃদ্ধি রোধ করে। যে কারণে বাঁ পায়ের তুলনায় ওর ডান পাটা ৪ মি.মি. ছোট হয়ে গেছিল। এর চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন—হাঁটুর জোড়ের কাছাকাছি 'নী-ক্যাপ' (হাঁটু মোড়ার টুপি)-এ জড়ানো গ্রোথ-প্লেট (বৃদ্ধি হওয়ার পাত) পরানো হয়। এই 'নী-ক্যাপ'টি মূলত পরিণত বয়সে হাড়ের চূড়ান্ত দৈর্ঘ্য ও আকৃতি নিরূপণ করতে ব্যবহৃত হয়।

এরপর বিশেষ যান্ত্রিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে কোনও ওষুধ ছাড়াই হাড়ের বৃদ্ধি সংঘটিত করা হয়। এই পদ্ধতি রোগী বা রোগিনীকে যেমন কোনও শারীরিক কষ্ট দেয় না, তেমনি এতে ইনফেকশনের কোনও সম্ভাবনাও নেই।

বছর দু'য়েক আগে তেজস্বিনী একদিন খুব কেঁদেছিল। কারণ সাইকেল চালাতে গেলে ডান পা ছোট হওয়ার জন্য তার খুব লাগত। আজ সে ঝলমলিয়ে হাসছে, সাইকেল চালাচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে। ভারত জিতে গেছে। মেটিরিয়া-মেডিকার কাব্যও!

অসমের সাত মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ

সি বি আই তদন্তের দাবী উঠল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারই অসমের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ নিয়ে গগৈ সরকারকে তদন্ত করতে বলছে। উত্তর কাছাড় স্বশাসিত জেলার উন্নয়নখাতে ১০০০ কোটি টাকার বরাদ্দ অন্যত্র চালান হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তদন্তের জন্য সিবিআই-কে অনুরোধ জানাতে বলেছে। এর ফলে একেবারে স্বখাত সলিলে পড়েছে গগৈ সরকার। কেননা ওই কোটি কোটি টাকা স্বশাসিত উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার উন্নয়নখাতে বরাদ্দ হওয়া সত্ত্বেও কোথায় কার পকেটে গিয়ে ঢুকেছে সেটা অবশ্যই তদন্তের বিষয়। কিন্তু তরুণ গগৈ-এর কাছে দুঃস্বপ্নের ব্যাপার হ'ল— ২০০৪-০৫ সালের ওই বিশাল আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে গিয়েছে শাসক দলের সাতজন কংগ্রেসী মন্ত্রী, একজন সাংসদ এবং একজন প্রাক্তন রাজ্যপালের নাম। যদিও আক্ষরিক অর্থে অসমের রাজধানী দিসপুরে এ পর্যন্ত কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে তদন্ত-নির্দেশের কথা স্বীকার করা হয়নি। সূত্র অনুযায়ী গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা (National Investigation Agency) গতবছরের ১৭ নভেম্বর বিশেষ বিচারকের আদালতে 'সন্ত্রাসবাদী-রাজনৈতিক' যোগাযোগ বিষয়ে চার্জশীট দাখিল করেছিল। এন আই এ-এর প্রস্তাব ছিল—যেহেতু, সরকারি কর্মীরাও সরকারি তহবিল এর যথাযথ ব্যবহার, অপরাধমূলক কাজকর্ম, তহবিল এধার-ওধার করাতে জড়িয়ে গিয়েছে সেজন্য সিবিআই তদন্ত করুক।

এরকম সুপারিশ ছিল কেন্দ্র সরকারের কাছে। তবে ওই তদন্তের জন্য রাজ্য সরকারের এবং অসম পুলিশের দুর্নীতি নিরোধক শাখার অনুমোদন নেওয়ার কথাও বলা হয়েছিল।

এটাও ঠিক যে এন আই এ-আইনে চার্জশীট দেওয়ার ফলে পরবর্তী তদন্ত কোনও রাজ্য সরকারি সংস্থা নয়—সিবিআই-ই করতে পারবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত হলো—রাজ্য সরকার সিবিআই-কে

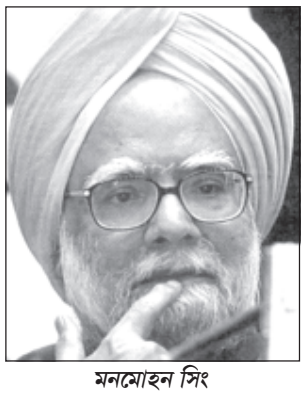

মনমোহন সিং

তরুণ গগৈ

তদন্তের জন্য অনুরোধ জানাবে না। কেননা, ওই চার্জশীটে নির্দিষ্ট করে কোনও মন্ত্রী বা সরকারি কর্মীর নাম বলা হয়নি। কিন্তু কেন্দ্র থেকে রাজ্য সরকারকে এই বৃহত্তম আর্থিক দুর্নীতির বিষয়ে তদন্তের জন্য সিবিআই-কে বলতে বলায় গাড্ডায় পড়েছেন গগৈ। এখন রাজধানী দিসপুরে জোর চর্চা চলছে, কেন্দ্রের এই নির্দেশকে রাজ্য সরকার কিভাবে ধামাচাপা দেয়।

এদিকে রাজ্য জুড়েই সি বি আই তদন্তের দাবী দিন দিন জোরদার হচ্ছে। অসমের সর্ববৃহৎ ছাত্র সংস্থা 'আসু' (অল অসম ছাত্র ইউনিয়ন) দাবী জানিয়েছে যে সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টের প্রত্যক্ষ নজরদারিতে সিবিআই তদন্ত হোক। ঠিক যেমনটা গুজরাটের 'বেস্ট বেকারী' মামলার ক্ষেত্রে হয়েছিল।

ইতিমধ্যে লোকসভার বিরোধী দলনেত্রী সুষমা স্বরাজ স্পীকার এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে অসমের উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার একহাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি নিয়ে সংসদে আলোচনার দাবী জানিয়েছেন। শ্রীমতী স্বরাজ নিজেই সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন। অসম থেকে নির্বাচিত বিজেপি সাংসদ রমেন ডেকা প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে লিখিতভাবে সিবিআই তদন্ত দ্রুত শুরু করার অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছেন। তিনি ওই চিঠিতে বলেছেন, "আপনিও অসমের সাংসদ। সেজন্য উন্নয়নের এক হাজার কোটি টাকা তছরূপের তদন্তে আপনারও আগ্রহী ও উদ্যোগী হওয়া কর্তব্য বলেই মনে করি।" অসমের শিলচর থেকে নির্বাচিত বিজেপি সাংসদ কবীন্দ্র পুরকায়স্থ লোকসভার স্পীকারকে বিষয়টি নিয়ে জিরো আওয়ারে আলোচনার জন্য নোটিশ দিয়েছেন। ফলে ভিতরে বাইরে চাপে পড়েছে কংগ্রেস।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলায় এই বিপুল আর্থিক কেলেঙ্কারির বিস্তারিত প্রতিবেদন স্বস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখন এ আই সি সি-র নেতারা সাংবাদিকদের এ ব্যাপারে সযত্নে এড়িয়ে চলছেন। সব মিলিয়ে প্রচণ্ড অস্তস্তিতে পড়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ এবং রাজ্য কংগ্রেস।

বাংলাদেশে জামাতে-জঙ্গিরা জোট বাধছে

সংবাদদাতা ঃ জামাতে-শিবিরের জঙ্গিরা ঢাকায় বড় ধরনের নাশকতা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। মিলিত হচ্ছে গোপন আস্তানায়। চলছে ঘন ঘন বৈঠক। ঢাকা ও তার আশপাশে জামাতে-শিবিরের ৪১টা স্থায়ী গোপন আস্তানা রয়েছে। বেশির ভাগই জামাত-এর নিজস্ব। ঢাকার বাইরের সব

ক্যাডারদের ঢাকায় তলব করা হচ্ছে। ঢাকায় আড্ডা-গেড়েছে কয়েক হাজার জামাত ছাত্রসংস্থা 'ছাত্র শিবিরের' ক্যাডার। এজন্য নেতা ও কর্মীরা আশপাশের ৪১টা গোপন আস্তানায় মিলিত হচ্ছে। এইসবই স্থায়ী ঘাঁটি। জঙ্গি-জেহাদিরাও ওই সব আস্তানায় যাতায়াত করছে। যাত্রাবাড়ী থানার দয়াগঞ্জ মসজিদ সংলগ্ন মেস, নিউমার্কেট এলাকার এলিফ্যান্ট রোড-এর ৫১নং ও ৬৬ নম্বর বাড়ির নীচতলা থেকে ৫ম তলা, পল্টনে 'গ্র্যাণ্ড আজাদ' হোটেলের পিছনের মেসে, মগবাজার জামাতে অফিস সংলগ্ন মেসগুলো, কলাবাগান থানাধীন বসির উদ্যান রোডে মসজিদ সংলগ্ন ৫তলা ভবন, ধানমণ্ডি ক্যাম্পের আশপাশের একাধিক মেসে, এ/১৬৭/৫ নম্বর বাড়ির ইসলামি সমাজ কল্যাণ ট্রাস্ট প্রভৃতি জায়গায় জামাতের ও জঙ্গিরা বহাল তবিয়তে রয়েছে। তারা একত্রিত হচ্ছে।

সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন 'ছাত্র লীগে'র কয়েকজন নেতাকে গলার নলি কেটে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে জামাতে-ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবিরের কুখ্যাত সন্ত্রাসীরা। তারপর বাংলাদেশের গোয়েন্দা বাহিনী তদন্ত নেমে সব খবর যোগাড় করেছেন। সর্বত্র সন্ত্রাসীরা আঘাত হানার পরিকল্পনা করেছে।

চীন থেকে আগ্নেয়াস্ত্র আসছে

সংবাদদাতা।। উত্তর পূর্বাঞ্চলের জঙ্গিদের কাছে ব্যাপক পরিমাণে অত্যাধুনিক চীনা আগ্নেয়াস্ত্র আসছে। ভারত-মায়ানমার সীমান্তের অন্তত পাঁচটি করিডর দিয়ে তা ভারতে পৌঁছে যাচ্ছে নির্দ্ধারিত গন্তব্যে। একজন সিনিয়র গোয়েন্দা অফিসার এই খবর জানিয়েছেন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকে যে সকল অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই 'মেড ইন্ চায়না' স্টার মার্ক-দেওয়া। ভারত-মায়ানমার সীমান্তে সক্রিয় কমপক্ষে বারোটি জেহাদি গোষ্ঠী চীন থেকে চারটি স্থলপথে এবং একটি জলপথে অস্ত্র-শস্ত্র আমদানী করে থাকে। ওই সকল অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে—চিরাচরিত এ কে ৪৭ রাইফেল, গ্রেনেড, পিস্তল, ক্যুইজ এবং হাতবোমা।

মায়ানমার লাগোয়া দক্ষিণ পশ্চিম চীনের ইউনান প্রদেশ থেকেই বেশির ভাগ অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করা হয়। তারপর মায়ানমার থেকে মণিপুরের উখরুল, চান্দেল, চূড়াচাঁদপুর, অরুণাচলের মোরে এবং মিজোরামের কোনও কোনও এলাকা দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ঢোকানো হয়। সমুদ্রপথে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে নামানোর পর স্থলপথে ভারতে নিয়ে আসা হয়। চীন ছাড়া অন্যান্য সূত্রেও কিছু আসে। তবে বেশির ভাগটাই চীন থেকে আসে বলে ওই গোয়েন্দা অফিসার জানিয়েছেন।

মালদায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে

সংবাদদাতা ঃ মালদা ॥ রাজ্য সরকার সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য যখন দশ শতাংশ সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করছেন তখন মালদা জেলার সংখ্যালঘু শিশু পাচার বাড়ছে, জাল নোট কারবারের সাথে সংখ্যালঘুরা বেশি করে জড়িত হচ্ছে, আফিম চাষও সংখ্যালঘু মুসলিম এলাকাতেই বেশি করে হচ্ছে। গত সপ্তাহে মালদা টাউন স্টেশন থেকে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ১৬ জন চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর শিশুদের পাচারের হাত থেকে উদ্ধার করেন। এই শিশুদের বেশির ভাগের বাড়ি গাজোল ও রতুয়ায়। প্রলোভন দেখিয়ে এইসব শিশুদের রাজ্যের বাইরে রেললাইনের কোনও কাজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বাড়িতে বেশি সন্তান থাকার জন্য এবং তাদের ঠিকমতো লালন পালন না করতে পারার জন্য শিশু শ্রম বেআইনী হলেও এদের সেই কাজেই নিয়ে যাচ্ছিল দফাদার সামউল আলি। অপর দিকে মালদা জেলায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে জাল নোট ঢুকে জেলার অর্থনীতিকে পঙ্গু করার চক্রান্ত করছে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন। গতসপ্তাহে ব্যাঙ্গালোর পুলিশের যৌথ উদ্যোগে মানিকচক থেকে মহঃ রফিক (২৪) ও সাবির শেখ (২২)-কে জাল নোট পাচারকারী হিসাবে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। এর আগে ব্যাঙ্গালোরে ধরা পড়ে শেখ রুহাল ও শেখ শামিম। কালিয়াচকের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলি থেকেও পুলিশ বাংলাদেশী জাল নোট পাচারকারীদের বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তার করেছে। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এইসব এলাকাতে বিভিন্ন হাট ও বাজারে এখন ৫০০ টাকার নোট নিয়ে মানুষ ভয় পাচ্ছে। একইসঙ্গে মালদা জেলার রতুয়া, চাঁচল, হরিশচন্দ্রপুর ও পুরাতন মালদা থানার বিভিন্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ ৪০০ বিঘে জমির আফিম গাছ নষ্ট করেছে। এছাড়া কালিয়াচক থানার মোজমপুর, শহিদপুর এলাকার সব থেকে বেশি আফিম চাষ ধরা পড়েছে।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই এলাকার ৫০০ বিঘা জমির আফিম গাছ নষ্ট করা হয়েছে বলে জেলা শাসক শ্রীধর ঘোষ জানিয়েছেন। সব মিলিয়ে সংখ্যালঘুদের সৎ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার বদলে উগ্র ধর্মীয় শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে তাদের আরও পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছেন।

কেরলে দেড় লক্ষাধিক সমাবেশ

হিন্দু ঐক্যের ডাক দিলেন মোহন ভাগবত

কোল্লামে অনুষ্ঠিত কার্যক্রমে মোহনরাও ভাগবত।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কোল্লাম শহরের আশ্রম গ্রাউণ্ড। ২৪ ফেব্রুয়ারি শীতের বেলার পড়ন্ত বিকেলের সূর্যালোকের মনোরম আমেজে চল্লিশ একর বিস্তৃত এই মাঠটিতে যেদিকেই তাকানো যায়, দেখা যাচ্ছিল অজস্র কালো টুপির সারি। পরিপাটী করে পরা হাতা-গুটোনো ফুলহাতা সাদা জামা আর খাঁকি হাফ-প্যান্ট। তার সাথে কালচে-লাল রঙের বেল্ট আর ফিতে দেওয়া কালো-রঙের বুট জুতোয় ভরে থাকা দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠটাকে তখন দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যাবে। মাঠের সামনের দিকে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে পেছনের দিকে তাকালে দেখা যাবে অসংখ্য নারকেল গাছের সারি। তাদের পাতার মড়মড়ানি জানান দিচ্ছিল সিপিএমের মধ্যে পদ্মলোচনানন্দনই ঠিক, বাকি সব ভুল। বাকিরা দেওয়াল লিখন পড়তেই পারছেন না। সেই কারণেই আর এস এসের কার্যালয় উদ্বোধন করতে এসে দলীয় নেতৃত্বের কোপে পড়তে হয়েছে পদ্মলোচনানন্দনকে। দেওয়াল লিখনটা খুব পরিস্কার। বামশাসিত কেরলেও কাজের দিনের বিকেলে লক্ষাধিক স্বয়ংসেবকদের 'পূর্ণ গণবেশে' সমাগম। লেখার গৌরচন্দ্রিকাতেই যে পোষাকের ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছিল, তাকেই বলা হয় পূর্ণ গণবেশ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বহু শুভ্যানুধায়ী। এই সংখ্যাটাও ছাড়িয়েছে পঞ্চাশ হাজার। তাই সব মিলিয়ে দেড়লক্ষের সমাবেশ ইঙ্গিত দিল পশ্চিমবঙ্গে 'রাজনৈতিক পরিবর্তনের' ঝড় থমকে যেতে পারে কলেজে এসে। কিন্তু কেরলের এই 'সামাজিক পরিবর্তনে'র ঝড়কে রুখবে কে?

'সামাজিক পরিবর্তনে'র মুখ্য উপলক্ষ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতের সরসঙ্ঘচালক হবার পর প্রথমবারের জন্য 'ভগবানের আপন দেশ' বলে কথিত কেরল প্রদেশে শুভাগমন। বিকেল পাঁচটায় যথারীতি ধবজারোহনের পর চিরাচরিত প্রথা মেনেই সরসঙ্ঘচালক প্রণাম এবং তারপরেই নিয়মমাফিক মোহনজী-র বক্তৃতা।

মোহনজীও যথাবিধি স্বয়ংসেবকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন—হিন্দুর নিঃস্বার্থ শক্তিই পারে দেশের যে কোনও সমস্যার সমাধান করতে। তাঁর কথায়, "শুধুমাত্র ভারত, যার মৌলিক দর্শন নিহিত রয়েছে হিন্দুত্বে;সারা বিশ্বকে এই দেশই পারে সঠিক পথ দেখাতে।" রাজনৈতিক দলাদলি আর অপ-সংস্কৃতির পঙ্কে নিমজ্জিত ভারতবর্ষীয় সমাজকে উত্তরণের পথও দেখিয়েছেন মোহনরাও ভাগবত। তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক হিন্দুর উচিৎ মানবজাতির কল্যাণে স্বার্থশূন্য ত্যাগের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। কারণ সবাই বলে যে কোনও সমাজের ন্যূনতম চাহিদা হলো একতা। কিন্তু এই 'একতা'-র প্রকৃত মূল্য একমাত্র ভারতবর্ষ-ই দিতে পারে। কারণ আমাদের কাছে এক এবং বহু কিংবা মানবজাতির সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কগুলির একটা অন্য ধরনের মূল্য রয়েছে।"

সংস্কৃতির পশ্চিমীকরণ নিয়ে পাশ্চাত্যের তুলোধনা করে তিনি বলেন—সামান্য কিছু লোক, তারা সমগ্র পৃথিবীর ৪ শতাংশও হবে কিনা সন্দেহ, তারাই গোটা পৃথিবীর যাবতীয় সম্ভাবনাকে ভোগ করছে। একইসাথে তিনি ভারত সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "সীমান্তে উপদ্রব করে এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির সহযোগিতায় চীন ভারতকে ঘিরে ফেলবার একটা সুযোগ পেয়ে গেছে। এই সংকটময় পরিস্থিতিতেও আমাদের দেশের সরকার বলছে যে কিছুই ঘটেনি! সেইসঙ্গে চরমপন্থী অর্থাৎ জেহাদী এবং মাওবাদীদের নিয়ে সরকারের অবস্থানের কঠোর সমালোচনা করেন শ্রীভাগবত। তাঁর মন্তব্য—"চরমপন্থার বিরুদ্ধে কেন সরকার তার অবস্থান দৃঢ় করতে পারছে না? কেনই বা তাঁদের কৃপাদৃষ্টি কেবল এদেরই ওপর (মাওবাদী ও জেহাদী) বর্ষিত হচ্ছে, যখন একইভাবে অনাথের মতো কাশ্মীরি পণ্ডিতরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন—কই তাদের বেলা তো সরকারের সহানুভূতি উথলে উঠছে না!" জেহাদীদের প্রতি কংগ্রেসের 'ক্ষমাশীল' মনোভাব নিয়ে তাঁর বিস্ময়—"যাঁরা দেশবিরোধীদের ক্ষমা করছেন, তাঁরা ভুলে গিয়েছেন দেশের একতার জন্য যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদেরকে।"

বি টি বেগুন ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কু-রুচির অনুপ্রবেশের জন্য তিনি পাশ্চাত্য জীবনশৈলী এবং অর্থনীতিকেই দায়ী করছেন। মুসলিম সংরক্ষণ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি মন্তব্য করেন—"যেদিন আদালত পর্যন্ত বলল যে সংরক্ষণ পদ্ধতি লাগু হতে দেরি আছে, ঠিক তার পরের দিনই পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়ে এল মুসলিমদের জন্য নতুন সংরক্ষণ পদ্ধতি!" এনিয়ে তিনি আরও বলেন—"আসলে রাজনৈতিক দলগুলো বর্তমানে একটা আচমকা বৃদ্ধি পাওয়া 'সেন্টিমেন্ট'-কে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আখেরে ক্ষতি করছেন দেশের ঐক্যেরই। কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার প্রসঙ্গে যে কোনও যুক্তি-গ্রাহ্য কারণকেও তাঁরাই অস্বীকার করেছেন। একটা কল্পিত চ্যালেঞ্জের ব্যাপার ছিলই। কিন্তু এই পরীক্ষায় লেটার মার্কসসহ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তিরুবনন্তপুরম ও কোল্লাম জেলার স্বয়ংসেবকরা। প্রায় সাড়ে চার হাজার শাখা থেকে লক্ষাধিক স্বয়ংসেবক তো বটেই, তাছাড়া হাজার পঞ্চাশেক সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ীও (সঙ্ঘ-বন্ধু বলা হয় যাঁদের) উপস্থিত ছিলেন মোহনজীর বক্তব্য শুনতে। সবচাইতে বড় কথা, সঙ্ঘের সহযোগী প্রতিটি সংগঠন এই 'কার্যক্রমে' রীতিমতো উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করেছিল। আর এস এসের কেরল প্রদেশের প্রান্ত কার্যবাহ পি. গোপালনকুট্টী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের পরিচয় করিয়ে দেন।

স্বয়ংসেবক ও সাধারণ মানুষকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানান স্বাগত সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ভি. রামচন্দন নাইয়ার। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রান্ত সঙ্ঘচালক পি ই বি মেনন।

আনুষ্ঠানিকতার রীতিনীতি বাদ দিলে মোহনজীর গোটা বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই সেই বক্তব্যের সারসত্যটাও সত্যিই অনিন্দ্যসুন্দর। কারণ তিনি বলেছেন—"হিন্দুত্ব হলো চিরসত্য দর্শন, এটা আধুনিকও। হিন্দুত্বকে আধার করেই ভারতবর্ষ এগিয়ে চলবে।"

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি

এমন শক্তিমান ঃ সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের একটুকরো খণ্ডচিত্র উপস্থিত উড়িষ্যা রাজ্যের এই কালাহান্ডি জেলায়। এখানকার নিয়ামগিরি হিলসের মতো অ্যালুমিনিয়াম সমৃদ্ধ এলাকাকে বেদান্ত অ্যালুমিনা লিমিটেড চুপি চুপি কিনে নিতে চাইছে। যে লিমিটেড কোম্পানীটির ১ লক্ষ মিলিয়ন টন ক্যাপাসিটি সম্পন্ন অ্যালুমিনিয়াম সংশোধনাগার রয়েছে লানজিগড় বক্সাইট খনির কাছেই। যাই হোক, এখানকার মানুষদের প্রতিবাদের চরিত্রটা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের তুলনায় একেবারেই আলাদা। প্রতিবাদের নেশায় রক্তপাত নয়, পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটাই এখানকার অধিবাসী জনজাতিদের প্রতিবাদের একমাত্র ভাষা। নিজেদের বাসস্থান আর পরিবেশ রক্ষায় এই 'ভাষা'টুকুই আশা নিয়ামগিরিবাসীদের।

আগ্রাসী ইসলাম

গ্রীট উইলডার্স

[শ্রীযুক্ত গ্রীট-উইলডার্স, চেয়ারম্যান, পার্টি অব ফ্রিডম, নেদারল্যান্ডস্। তাঁর "আমেরিকা আগামী দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যেই নিজ পরিচিতি হারাবে। তখন আমেরিকাতেই এই প্রশ্ন উঠবে কে ইউরোপকে গ্রাস করল? কিংবা ইউরোপের নিজ পরিচয় হারানোর কারণ কি?"— শীর্ষক ভাষণ থেকে নিম্নলিখিত অংশটি নেওয়া হয়েছে।

শ্রীযুক্ত উইলডার্স, দি ফোর সিজিনস্, নিউইয়র্কে এই ভাষণটি দিয়েছিলেন এবং www. greet wilders. nl. 25th Feb. 2009-তে পাওয়া যাবে।]

বন্ধুগণ,

এখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আমেরিকায় এসেছি। বর্তমানে বিশ্বে সবকিছু ঠিকঠাক

চলছেনা। ভয়াবহ বিপদ ঘনিয়ে আসছে এবং এই পরিস্থিতিতে আশাবাদী হওয়া খুবই কঠিন।

আমরা সমগ্র ইউরোপের ইসলামীকরণের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। বিষয়টা শুধুমাত্র ইউরোপের বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিপদ নয়, এটা আমেরিকার সাথে সাথে সমস্ত ইউরোপের পক্ষেও সমান বিপজ্জনক। এর কারণ আমেরিকা পাশ্চাত্য সভ্যতার শেষ দুর্গ (আশ্রয়স্থল)। তাই ইসলামিক ইউরোপ আমেরিকার কাছে খুবই উদ্বেগের বিষয়।

আমি প্রথমে আপনাদের ইউরোপের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কিছু বলব। তারপর ইসলাম বিষয়ে কিছু কথা আপনাদের জানাব। পরিশেষে জেরুজালেমের কথাও বলব।

আপনারা জানেন ইউরোপ পরিবর্তিত হচ্ছে। সম্ভবত এই পরিবর্তনের কিছু লক্ষণ আপনাদের চোখে পড়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন শহরে বা জনপদে গেলে দেখতে পাবেন—আপনার গন্তব্যের অদূরবর্তী অঞ্চলে রয়েছে এক অন্য জগৎ। এই জগৎটি হলো ইউরোপের মূল সমাজের সমান্তরাল একটি সমাজ, যা তৈরি হয়েছে বিপুল সংখ্যক বিদেশী মুসলমানের সমাহারে।

(এজন্য) সমগ্র ইউরোপ জুড়ে এক নতুন বাস্তব স্থিতি ক্রমশ আধিপত্য বিস্তার করছে। মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে দেশীয় মুসলমানদের দেখা যায় না। যদি বা দেখা যায় তার সংখ্যা খুবই কম। এই বিষয়টি পুলিশেরও নজরে এসেছে। হিজাব'এ মাথা ঢেকে মহিলারা অগণিত তাঁবুর আশে-পাশে ঘোরাফেরা করছে—এদের অধিকাংশের কোলে রয়েছে বাচ্চা আর সাথে সাথে চলছে একদল অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে। এই সব মহিলাদের স্বামী বা মনিবরা এদের থেকে দু'পা তফাতে আগে আগে হেঁটে যাচ্ছে। বহু রাস্তার ধারে মসজিদ তৈরি হয়েছে। দোকানগুলোতে এমন কিছু লেখা বা চিহ্ন রয়েছে যা আমরা পড়তে বা বুঝতে পারি না। এইসব অঞ্চলে (সুষ্ঠ) জীবিকার প্রয়াস কদাচিৎ আপনার চোখে পড়বে। এই স্থানগুলি হলো মুসলিম ঘেটো (সামূহিক আবাস ক্ষেত্র), যার নিয়ন্ত্রণ গোঁড়া ধর্মান্ধদের হাতে। এই ধরনের মুসলিম বসতি ইউরোপের বিভিন্ন শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো বেড়ে চলেছে। এইসব বস্তীতে, রাস্তায় রাস্তায়, পাড়ায় পাড়ায়, শহরে শহরে সংশ্লিষ্ট ইউরোপীয় দেশগুলির উপর স্থানীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখার অস্ত্র (মোক্ষম উপায়)।

বর্তমানে ইউরোপ মহাদেশে হাজার মুসলমানদের হাতে মার খায়। অ-মুসলমান মহিলাদের প্রতি অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করা প্রতিদিনের ঘটনা। স্থানীয় টেলিভিশন কেন্দ্রের পরিবর্তে অন্য দেশের (আরবের) টিভি'র অনুষ্ঠান দেখানো—শোনার জন্য ডিস এন্টেনা ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফ্রান্সে স্কুল শিক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—যা কিছু ইসলামের পক্ষে আপত্তিকর বলে মনে হবে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। আর এর আওতায় ভলটেয়ার থেকে ডারউইন সবাই পড়ে। "হলোকাস্ট" (Holocaust) এই জন্য পাঠ্য থেকে বাদ গেছে।

বৃটেনের শরিয়তি আদালত এখন সরকারি ভাবে দেশের বিচার ব্যবস্থার অঙ্গীভূত। ফ্রান্সের বহু এলাকায় হিজাব'এ মাথা না ঢাকা মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ। সম্প্রতি মুসলমানরা এক ব্যক্তিকে প্রচণ্ড মারধর করে, কারণ তিনি রমজান মাসে মদ খেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্স থেকে বিপুল সংখ্যক ইহুদী সেমেটিক বিরোধী তাণ্ডবের জন্য দেশ ত্যাগ করে। আজ তেল-

৭ জুলাই ২০০৫, লণ্ডনে টিউবরেলে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের খণ্ডচিত্র।

হাজার মসজিদ তৈরী হয়েছে। এইসব মসজিদে যাওয়া আসা করা লোকজনের সংখ্যা গির্জার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আসা লোকদের থেকে অনেক বেশী এবং এর সাথে পাল্লা দিয়ে ইউরোপের প্রতিটি শহরে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এগুলির আকার-আয়তনের কাছে স্থানীয় গির্জাগুলি নেহাৎই "বামন" বলে মনে হবে। এ থেকে একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠানো হচ্ছে—"আমরাই শাসন করছি"।

বহু ইউরোপীয় শহরের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ মুসলমান—উদাহরণ হিসাবে আমস্টারডাম, মারসেইলস্ এবং সুইডেনের মালমো শহরের উল্লেখ করা যায়। বহু শহরের ১৮ বছর বয়সীদের সিংহভাগই হলো মুসলমান। প্যারিস শহরটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। শহরের বালকদের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম "মহম্মদ"।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে Farm শব্দটি ভুলেও উচ্চারণ করা হয় না। পাছে এই শব্দটির একটি অর্থ শূকর পালন করার খামার হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। কারণ শুয়োর মুসলমানদের কাছে অপবিত্র প্রাণী তাই মুসলমানদের কাছে এই প্রাণীটির বিষয়ে কোনও উল্লেখ খুব আপত্তিকর। বেলজিয়াম ও ডেনমার্কের বহু বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শুধুমাত্র হালাল (ইসলাম অনুমোদিত খাদ্য সম্ভার) খাবার পরিবেশন করা হয়। (পরমত) সহিষ্ণু আমস্টারডামের যুবকেরা প্রায়শই মুসলমানরা ইজ্জৎ (সম্মান) দাবী করে। তাদের মতামত বা দাবী মেনে নেওয়াই হলো তাদের সম্মানিত করার দ্যোতক। আমাদের সরকারি ছুটির তালিকায় মুসলমান পরবের জন্য ছুটি বরাদ্দ আছে।

নেদারল্যাণ্ডে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে শরিয়তি আইন গ্রহণ করার পক্ষে খৃস্টান ডেমোক্রাটিক এ্যাটর্নী জেনারেল মত প্রকাশ করেছেন। মরক্কো ও তুরস্কের পাসপোর্ট ধারী ব্যক্তিগণ আমাদের মন্ত্রীসভার সদস্য। মুসলমানরা তাদের দাবী দাওয়া সাধারণত বেআইনী কার্যকলাপের মাধ্যমেই জানান দেয়, যেগুলি ছোটখাটো অপরাধ থেকে লাগামছাড়া দাঙ্গা সবকিছুই হতে পারে। উদাহরণ হিসাবে অ্যাম্বুলেন্স ও বাসচালকদের (অকারণে) মারধর করা, ছোটখাটো দাঙ্গা বাধানো এইগুলি দাবী আদায়ের উপায় হিসাবে ধরা হয়। প্যারী শহরতলীতে এই ধরনের কার্যকলাপ ক্রমশঃ বাড়ছে। এই দুষ্কর্মকারীদের আমি বহিরাগত বলে মনে করি কারণ এরা তাই-ই।

বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনায় পথে ঘাটে আক্রান্ত হন শুধুমাত্র অমুসলমান জনগণ আভিভ শহরের রাস্তায় ফরাসী ভাষায় কথোপকথন শোনা একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা। আমি এইরকম বহু ঘটনা উল্লেখ করতে পারি।

বর্তমানে ইউরোপ মহাদেশে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ মুসলমান বসবাস করে। সম্প্রতি সানডিয়াগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে মাত্র ১২ বছরের মধ্যে ইউরোপের জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ হবে মুসলমান। বার্নার্ড লিউস ভবিষ্যৎবাণী করেছেন—এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ মুসলমানরা (ইউরোপে) সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে।

(এতক্ষণ যা বলা হল) সবই সংখ্যার হিসাব। এবং এই সংখ্যার হিসাব নিয়ে এখনই ভয় পাবার কিছু নেই কারণ যতক্ষণ না এই বহিরাগত মুসলমানেরা তাদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য এককাট্টা হচ্ছে। অবশ্য এই বিষয়ে কিছু কিছু আভাস-ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। যেমন—পিউ রিসার্চ সেন্টারের (Pew Research Center) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ৫০ শতাংশ ফরাসী মুসলমানের আনুগত্য ফ্রান্সের চেয়ে ইসলামের প্রতি অনেক বেশী। এক তৃতীয়াংশ ফরাসী মুসলমান আত্মঘাতী হামলায় কোনও দোষ দেখেন না। দি ব্রিটিশ সেন্টার ফর সোস্যাল কোহেশন (The British Centre for Social Cohesion) জানিয়েছে এক তৃতীয়াংশ বৃটিশ মুসলিম ছাত্র খলিফারাজের (পৃথিবীব্যাপী) পক্ষে মত পোষণ করে।

এবং এজন্য সন্ত্রস্ত মানুষ ঘরবাড়ী ছেড়ে স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হচ্ছে এমন কি দেশান্তরীও হচ্ছে। উপরন্তু বর্তমানে মুসলিম ভোট সংখ্যাগতভাবে নির্ণায়ক ভূমিকা নিচ্ছে তাই মুসলমাদের অগ্রাহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না।

দ্বিতীয় বিষয় যা আপনাদের জানা দরকার তা হলো পয়গম্বর মহম্মদের গুরুত্ব (মুসলিম সমাজে)। এঁর (হজরত মহম্মদের) যাবতীয় যা কিছু সবই অনুকরণ ও অনুসরণ যোগ্য এবং ইনি সকল সমালোচনার উর্দ্ধে। এখন আমরা যদি এঁকে শান্তির প্রতিভূ বলে মনে করি যেমন গান্ধীজী বা মাদার টেরিজাকে মনে করা হয় বা মান্যতা দেওয়া হয়, তাহলে কোনও সমস্যা থাকে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মহম্মদ ছিলেন একজন যুদ্ধবাজ, গণহত্যাকারী এবং একই সাথে বহু বিবাহকারী। ইসলামের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি তিনি কিভাবে যুদ্ধ করেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে কিভাবে শত্রুদের হত্যা করেছিলেন, তিনি কিভাবে যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করেছিলেন। মহম্মদ নিজে ইহুদী উপজাতি বানু কুরাইজা গোষ্ঠীর লোকদের হত্যা করেছিলেন। যা কিছু ইসলামে "ভাল" বলে স্বীকৃত তাই "ভাল" আর ইসলামে "খারাপ" তা অবশ্যই "খারাপ" (এটাই ইসলামের সিদ্ধান্ত)।

এই ইসলামকে ধর্ম বলে ভুল করার কোনও কারণ নেই। যদিও এখানে ভগবান (আল্লা) আছেন, পরলোক (বেহেস্তে ও জাহান্নাম) আছে এবং বাহাত্তর জন কুমারী (হুরী) আছে। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে ইসলাম একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ বা দর্শন। এটা এমন একটি পদ্ধতি যাতে মানবজীবন ও সামাজিক বিধিনিষেধ বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হয়েছে। ইসলাম কথার অর্থ সমর্পণ। ইসলাম স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রকে সহ্য করে না অর্থাৎ মানে না, কারণ ইসলাম শুধুমাত্র (কঠোরভাবে) শরিয়তকে মেনে চলে। যদি আপনারা ইসলামকে অন্যকিছুর সাথে তুলনা করতে চান তবে এর সঙ্গে তুলনীয় হলো সাম্যবাদ (কমিউনিজম) এবং জাতীয় সমাজতন্ত্র (ন্যাশানাল সোস্যালিজম) কারণ এগুলো সবই সর্ব-আগ্রাসী মতাদর্শ বা দর্শন।

এখন আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারলেন উইন্সটন চার্চিল কেন ইসলামকে "পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পশ্চাদ্‌গতি শক্তি" বলে উল্লেখ করেছিলেন এবং কেন কোরানকে "মেইন ক্যাম্প"-এর (হিটলার প্রণীত) সাথে তুলনা করেছিলেন। সাধারণ মানুষ প্যালেস্তানীয়দের বক্তব্য মেনে নিয়েছিল এবং

(এরপর ৯ পাতায়)

সাচার কমিটির রিপোর্ট ও মুসলমান সমাজ

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

কথিত আছে পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু ইউরেনিয়াম, আর ভারতে সবচেয়ে মূল্যবান হলো মুসলমান ভোট। সেটা পেতে গত লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেস যে ইস্তাহার প্রকাশ করে তার ২২ নং পাতায় লেখা হয়েছে—"The congress has provided reservation for Muslims in Karnatak and Kerla in Govt. employment on the ground that they are socially backward class. The Congress is Committed to adopt on a national scale." এই ইস্তাহারের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদেরকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে এবং তাদের পশ্চাদপদতা এবং কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা নির্ণয় করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচারকে নিয়োগ করে।

বিচারপতি সাচার তাঁর রিপোর্টে শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতার যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তার ভিত্তিতে মনে হয় মুসলমানরা সত্যই অনগ্রসর, কিন্তু কতগুলি ক্ষেত্রে যে তাদের একচেটিয়া অধিকার তা সাচার কমিটির রিপোর্ট উল্লেখ নেই। যেমন পোষাক তৈরী, গাড়ীর মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, কৃষি শ্রমিক, মাটি কাটা শ্রমিক, চর্মশিল্প শ্রমিক, চটকল শ্রমিক, জাহাজে নিম্ন শ্রেণীর কর্মী, ফল ব্যবসায়ী, কসাই, শয্যা দ্রব্য তৈরি ইত্যাদি। এছাড়া চোরাচালান, অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাসবাদীদের আমদানী ও আশ্রয় দিয়ে টাকা রোজগারের ব্যাপারটাও আছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অনগ্রসরতার কথাই ধরা যাক, তারা ইচ্ছে করেই আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করবে না, কারণ বাংলা ও ইংরেজী কাফেরদের ভাষা। মাদ্রাসায় তারা আরবী পড়তেই বেশি আগ্রহী, যা চাকুরী ক্ষেত্রে কোনও কাজেই লাগে না। মুসলিম নারীদের শিক্ষার জন্য বেগম রোকেয়া কলকাতার সর্বপ্রথম স্কুল খুলে ছিলেন, তার মৃত্যুর পর তার মরদেহ মুসলিম কবরখানায় নিয়ে গেলে কট্টর মোল্লারা সেখানে তাকে কবর দিতে দেয়নি। রোকেয়ার অপরাধ ছিল তিনি মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রদূত ছিলেন যা ইসলাম বিরোধী।

বর্তমান যুগে উন্নতির আর একটা সোপান হলো পরিবার পরিকল্পনা।

মুসলমানরা ধর্মের দোহাই দিয়ে সে পথ একদম মাড়াচ্ছেন না। যেখানে হিন্দুদের পরিবারে ১টি বা ২টি সন্তান, সেখানে মুসলমান পরিবারে প্রতি দম্পতির ৭/৮টি সন্তান।

মুসলমানদের অনগ্রসরতার একটা কারণ হলো তিন তালাক প্রথা। যখন তখন। তালাক তালাক তালাক বলে স্ত্রীদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া। গত ডিসেম্বর ২০০৮-এ কলকাতায় স্বামী পরিত্যক্তা মুসলিম মহিলাদের তিনদিনের একটা সম্মেলন হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর মুসলিম মহিলা যোগ দিয়েছিলেন। ওই সম্মেলনে মুর্শিদাবাদের 'রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি'র নেত্রী খাদিজা বেগমের ভাষায় "রাজ্যের সবচেয়ে বেশি মুসলিম অধ্যুষিত (প্রায় ৭০ শতাংশ) জেলা মুর্শিদাবাদে স্বামী পরিত্যক্তা মহিলার সংখ্যা প্রায় তিন লাখ (এই তিন লাখ মহিলাকে তালাক না দিয়ে বাচ্চা-কাচ্চা সহ বের করে দেওয়া হয়েছে)। তালাক প্রাপ্তা মহিলার সংখ্যা এক লাখেরও বেশি। কী হবে তা হলে এদের?" এখানে চিন্তা করার একটা ব্যাপার আছে, এদের গর্ভজাত সন্তানরাই হবে চোর ডাকাত সমাজ বিরোধী, অথচ শিক্ষিত মুসলমানদের এইসব দিকে নজর দেওয়ার কোনও প্রচেষ্টা নেই।

গত ২০০৭-এর ১৩ মার্চ তারিখে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা থেকে জাহানারা বেগম নামে একজন প্রাক্তন শিক্ষিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটা প্রথম শ্রেণীর দৈনিকে এক পত্র লেখেন। তাতেও তিনি লিখেছেন—"কালাহান্ডি, আসানসোল, ডুয়ার্সের চা বাগানে অনাহারে মরে হিন্দু আদিবাসী ও খৃস্টানরা। আল্লার কৃপায় অন্তত আমরা মুসলমানরা মরছি না। কিছু কিছু পেশায় আমাদের একচেটিয়া অধিকার যেমন দর্জিশিল্প, জরির কাজ, রেডিমেড পোশাক, মাংসের দোকান, বিড়ি শিল্প ইত্যাদি।"

এখানে উল্লেখ্য যে পাকিস্তান সৃষ্টির পর অধিকাংশ মুসলমান ভারতেই রায় গেলেন। পাকিস্তানে যাওয়ার কথা চিন্তাই করেনি। করবেনই বা কেন? এখানে তো বহাল তবিয়তেই আছেন। কাফেরদের টাকায় হজ করতে যাচ্ছেন, তিন লক্ষ ইমাম ভারত সরকারের থেকে মাইনে পাচ্ছে। তালাক প্রাপ্ত মহিলারা মাসিক ভাতা পাচ্ছে, মুসলমান ভোট ভিখারী রাজনৈতিক দলগুলি শুধুমাত্র মুসলমানদের উন্নয়নের জন্য চিন্তিত। অথচ তারা দেশের ১০ কোটি জনজাতিদের কথা বলছেন না কেন? জনজাতিদের আর্থসামাজিক অবস্থা মুসলমানদের থেকেও তো শোচনীয়। অথচ এদের কথা কোনও রাজনৈতিক দলই চিন্তা করে না কারণ তারা মুসলমানদের মতো সংগঠিত এবং মারমুখী নয়।

সর্বশেষে বলতে চাই, মুসলমানরা যদি তাদের সত্যিকারের উন্নতি চায় তবে অভিন্ন দেওয়ানী বিধি মেনে নেওয়া, মাদ্রাসা শিক্ষা বর্জন করা, কথায় কথায় তালাক দিয়ে স্ত্রীদের বিতাড়ন বন্ধ করা ও বহুবিবাহ পরিহার করা এবং পরিবার পরিকল্পনা মেনে নিতে হবে — তখনই তাদের উন্নতি হওয়া সম্ভব। তা না হলে ১০০ ভাগ চাকুরী তাদের জন্য সংরক্ষিত হলেও তাদেরকে মুসলমান হয়েই থাকতে হবে, মানুষ হওয়ার কোনও পথ দেখ্‌ছি না।

আগ্রাসী ইসলাম

(৮ পাতার পর)

ইজরায়েলকে আগ্রাসী ভেবেছিল। আমি ইজরায়েলে কিছুদিন ছিলাম এবং কয়েকবার বেড়াতেও গিয়েছি।

আমি ইজরায়েলকে সমর্থন করি কারণ প্রথমতঃ এই দেশটি (ঐতিহাসিক ভাবে) ইহুদীদের বাসভূমি, যা ইহুদীরা ২০০০ বছরের নির্বাসন এবং অসউইচ্ নাৎসী কনসেনট্রেশন ক্যাম্প কাণ্ডের পর ফিরে পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ইজরায়েল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তৃতীয়তঃ ইজরায়েল আমাদের (ইউরোপীয় দেশবাসীদের) প্রতিরক্ষার প্রথম বলয়। এই ছোট্ট দেশটি জেহাদী আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ইসলামিক আগ্রাসনকে প্রতিহত করছে। ইজরায়েল যেমন জেহাদী আক্রমণের শিকার; একইভাবে কাশ্মীর, কোসোভো, ফিলিপাইনস্, দক্ষিণ থাইল্যাণ্ড, সুদানের দফুর, লেবানন, ইন্দোনেশিয়ার আসির জেহাদী সন্ত্রাস কবলিত। যেমন ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় পশ্চিম বার্লিনের অবস্থা ছিল।

ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুধুমাত্র ইজরায়েলের বিরুদ্ধে নয়। এটা আসলে পশ্চিমের (পাশ্চাত্যের) বিরুদ্ধে জেহাদ। আর ইজরায়েল এই জেহাদের মার সহ্য করছে যা আমাদের সকলের জন্য বরাদ্দ। যদি ইজরায়েল না থাকত তাহলে ইসলামী সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণ শানাতে অন্য দেশ বেছে নিত তাদের লোলুপতা, লালসা তৃপ্ত করার জন্য। আমি ইজরায়েলী পিতা-মাতাদের ধন্যবাদ জানাই কারণ তাঁরা তাঁদের সন্তানকে রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে নিজেরা বিনিদ্ররাত্রি যাপন করছেন আর এই জন্যই ইউরোপ, আমেরিকার পিতামাতারা নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছেন এবং ঘনায়মান বিপদ সম্বন্ধে কিছুমাত্র আচঁ করতে পারছেন না।

আমাদের মুসলিম সংখ্যালঘুদের দাবীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে ইউরোপের বহু মানুষ ইজরায়েলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলেন। যদি ইজরায়েল ঈশ্বর দ্বারা নিষিদ্ধ দেশ হতো, যদি সেখানে যাওয়া নিষেধ করা হতো তাহলে ইজরায়েল ইউরোপের জন্য কোন সান্ত্বনা বয়ে আনতো না। এর মানে কখনই এটা নয় যে আমাদের (সমাজের) মুসলমান সংখ্যালঘুরা হঠাৎ তাদের আচার আচরণ বদলে আমাদের মূল্যবোধগুলি (সাদরে এবং সাগ্রহে) গ্রহণ করবে। অপরদিকে ইজরায়েলের অবলুপ্তি ইসলামী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে অপরিসীম (উৎসাহ) সাহস যোগাবে। তারা সঠিক ভাবেই প্রমাণ করতে পারবে ইজরায়েলের পতন বা ধ্বংস মানে হলো দুর্বল পাশ্চাত্য—যা শীঘ্রই শেষ হবে। ইজরায়েলের অবলুপ্তির অর্থ আমাদের ইসলাম সম্পর্কিত সমস্যার অবসান নয়—সূত্রপাত মাত্র। এটা হবে সারাবিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের প্রথম মহাযুদ্ধ। যদি ইজরায়েল কুক্ষিগত হয় সবকিছুই এদের (মুসলমানদের) হাতের মুঠোয় এসে যাবে।

(স্বঘোষিত) সাংবাদিক, স্বেচ্ছাকর্মীরা ইসলামীকরণ বিরোধীদের এবং সমালোচকদের দক্ষিণপন্থী উগ্রপন্থী বা বর্ণ/জাতি বিদ্বেষীর তকমা লাগিয়ে দেবে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় গৃহীত ভুল নীতির কারণে আমার দেশ নেদারল্যাণ্ডে ৬০ শতাংশ জনসংখ্যা এখন দেখতে পাচ্ছে ব্যাপক মুসলিম গণ অভিবাসন। এবং বাকী ৬০ শতাংশ ইসলামকে সবচেয়ে বড় বিপদ হিসাবে দেখছে। যদিও এছাড়া অন্য বিপদ আছে যা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ থেকে বেশী বিপদ-জনক তা হলো আমেরিকার দৃশ্যপট যা এই বিষয়ে শেষ ব্যক্তি বা লক্ষ্য রূপে দাঁড়িয়ে আছে। এই আলো (সংকেত) আপনাদের অনুমানের থেকেও দ্রুত গতিতে সমগ্র ইউরোপে প্রসারিত হবে। ইসলামিক ইউরোপের অর্থ গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা বিবর্জিত ইউরোপ, অর্থনৈতিক ভাবে বন্ধ্যা, বুদ্ধি জীবীদের রাতের দুঃস্বপ্ন এবং সামরিক শক্তিহীন আমেরিকা কারণ (ইসলাম কবলিত হবার কারণে) মিত্রদেশগুলি শত্রু ভাবাপন্ন হবে আর এই সকল শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলির পরমাণু অস্ত্র সম্ভার আছে। এই ইসলামী ইউরোপের অভ্যুদয়ের পর আমেরিকাকে একক প্রচেষ্টায় রোম, এথেন্স এবং জেরুজালেমের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রিয় বন্ধুগণ, স্বাধীনতা হলো সবচেয়ে দামী উপহার। আমার প্রজন্মকে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে হয়নি। স্বাধীনতার জন্য যাঁরা প্রাণ পণ করে লড়াই করেছিলেন তাঁদের সেই লড়াই-এর ফসল আমরা অযাচিতভাবে পেয়েছি। সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কবরখানাগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেই সমস্ত তরুণদের যারা কোনদিনই এই ভূমিকে নিজেদের বাসস্থান রূপে পেল না—তাদের স্মৃতি আমরা সযত্নে মনের মধ্যে লালন পালন করি। আমার প্রজন্ম স্বাধীনতা অর্জন করেনি—আমার প্রজন্ম এই প্রাপ্ত স্বাধীনতার অছিমাত্র। আমরা শুধুমাত্র আমাদের হেফাজতে থাকা এই স্বাধীনতা অবিকৃতভাবে ইউরোপের নবপ্রজন্মের হাতে সমর্পণ করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। আমরা এই বিষয়ে কোন মোল্লা বা ইমামের সাথে রফা-সমঝোতা করতে পারি না। (যদি করি) ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবেন না। আমরা স্বাধীনতার অপব্যবহার করতে পারি না। সোজা কথায় এরকম করার কোন অধিকার আমাদের নেই।

(অনুবাদক ঃ অভিজিৎ রায়চৌধুরী)

সংরক্ষণের নামে সংখ্যালঘু তোষণ

ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের সংখ্যালঘু তোষণ নতুন কিছু ঘটনা নয়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশ মতো চাকরিতে মুসলিম সংরক্ষণের কথা ঘোষণায় আরও একবার তা প্রমাণ হলো। বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে একমাত্র ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করার জন্য এই সংখ্যালঘু তোষণ রাজনৈতিক চালাকি ছাড়া কিছু নয়। একের পর এক ভোটে শোচনীয় পরাজয়ের পর দিশেহারা সিপিএম তথা বামফ্রন্ট মুসলিম তোষণে অগ্রসর হবে, এঘটনায় অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু প্রশ্ন জাগে মুসলিমরা কি অন্যদের তুলনায় অনগ্রসর বা অনুন্নত? মুসলিমরা কি আর্থিক উন্নয়নে পিছিয়ে আছে? চাকরিতে মুসলিমদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আছে কি? একথা অনস্বীকার্য যে সারা দেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, হিন্দু নরনারীর প্রতি অত্যাচার, সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাবার মূল কাণ্ডারি কিন্তু মুসলমানরাই। আর বাংলা তথা ভারতের জাতীয়তাবিরোধী স্বার্থান্বেষী ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক কিছু দল সেই মুসলমানদের প্রতি সহনশীল ও উদার মনোভাব পোষণ করে তাদের তোষণ করে চলেছে। এমনিতেই জনবিন্যাসের ব্যাপক পরিবর্তনে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠেছে। এমনিতেই জনবিন্যাসের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মুসলিমরা যেভাবে নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে আগামীদিনে হয়তো হিন্দুরাই সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। তাহলে মুসলমানদের সংখ্যালঘু বলা কতটা সমীচিন? 'সংখ্যালঘু' আখ্যার মাধ্যমে ভারতে তাদের পৃথক অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না কী? তাহলে ভারতীয়বোধে কিভাবে মুসলমানরা উদ্বুদ্ধ হবে? ভারতপ্রেমী ভারতবাসী হিসেবে তারা কি নিজেদের আদৌ গণ্য করে? এহেন মানসিকতার জন্য চাকরিতে মুসলিম সংরক্ষণ কতটা যুক্তিযুক্ত তা সর্বহারার নেতারা এর কোন সদুত্তর দিতে পারেন? এর আগেও সাচার কমিটি মুসলিম তোষণে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক রিপোর্ট পেশ করেছিল। যদি প্রশাসনিক বিভিন্ন স্তরে উচ্চপদে সংরক্ষণের কারণে মুসলিমদের আধিক্য ঘটে তবে বাংলা তথা ভারতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ কতটা নিরাপদে থাকবে তা অনুমানের বিষয়। চাকরিক্ষেত্রে যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিৎ। কিন্তু সংরক্ষণের মাধ্যমে মুসলিম প্রীতি দেখিয়ে বিধানসভা ভোটের বৈতরণী পার হবার স্বপ্ন দেখছে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট। কিন্তু বাংলার সচেতন মানুষ পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিতে আর বিশ্বাস করে না। তাই এটা কাল হিতে বিপরীত হবে না তো?

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

জম্মু-কাশ্মীর থেকে হিন্দু বিতাড়নে চুপ কেন?

বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে মারাঠী বনাম উত্তর ভারতীয়দের নিয়ে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলছে। শুরুটা করেছিলেন রাজ ঠাকরে। পরে যোগদান করে শিবসেনা, মহারাষ্ট্রের মানুষের কর্মহীন হওয়ার কারণ বলা হচ্ছে। ব্যাপকহারে উত্তর ভারতীয়দের মুম্বাই আসা মহারাষ্ট্রে বসবাস করাকে। এনিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে কিছু নেতা জলঘোলা করে আসছিলেন। মজার ব্যাপার হল জাতীয় কংগ্রেস গোটা ঘটনায় নীরব দর্শক সেজে এতদিন বসেছিল। কারণটা সবার জানা। রাজ ঠাকরে যত শক্তিবৃদ্ধি করবে ভোটের বাক্সে ততই সেনা-বিজেপি জোটের ক্ষতি আর কংগ্রেসের লাভ। তাই লোকসভা ও বিধানসভা ভোটের ফলাফল হাতে পেয়ে কংগ্রেস তার 'রাজ-তোষণ'-এর সফলতা পায়। সবই চলছিল বেশ ভালো, সেদিন আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত এবিষয়ে মুখ খোলার পরই কংগ্রেসের যুবরাজ মিডিয়ার সামনে উত্তর ভারতীয় জনগণের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বললেন, ভারতের যে কোনও প্রদেশে বসবাস করার অধিকার, যে কোনও নাগরিকের রয়েছে, এবং তার উল্লঙ্ঘন হলে তিনি প্রতিবাদ করবেন। এরপর উগ্র মারাঠা সেনাপতিদের প্রতি শক্তি প্রদর্শন করার জন্য তিনি মুম্বাইয়ের লোকাল ট্রেনে চেপে মহারাষ্ট্রের আম আদমিদের সই বিলিয়ে দিল্লি চলে গেলেন। গোটা দেশের মিডিয়ার প্রশংসা ও প্রচার পেলেন। দেশের মানুষ জানতে চাইবে যে, মহারাষ্ট্রের মাটি থেকে উত্তর ভারতীয়দের বিতাড়ন করা যদি অপরাধ হয়, তাহলে জম্মু-কাশ্মীর থেকে হিন্দু পণ্ডিতদের বিতাড়ন করাও অপরাধ। প্রথমটির জন্য যদি আপনি প্রতিবাদ করতে পারনে তবে দ্বিতীয়টির জন্য নীরব কেন থাকবেন?

—শিবনাথ দে, উলুবেড়িয়া, হাওড়া।

সরকারি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন

"সরকারি হাসপাতালে প্রেসক্রিপশনে ওষুধের 'জেনেরিক নাম' লেখার নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার"—এই প্রসঙ্গে এই পত্রের অবতারণা। এই নির্দেশ যতবার দেওয়া হয়েছে ততবারই, হাসপাতাল, সরকারী পলিক্লিনিকের ও সরকারী সাহায্যে পরিপুষ্ট সকল সেবামূলক প্রতিষ্ঠানেই রোগীদের ওষুধ লিখলে জেনেরিক নামেই লিখতে হবে বলে সরকারী ফরমান বহুবার জারি হওয়া সত্ত্বেও ডাক্তারবাবুরা সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেন? স্বার্থ না থাকলে কি আর ফুল ডাক্তারবাবুরা জেনেরিক নাম ব্যবহার করেন? প্রথমেই আসি লাইগেসনের ব্যাপারে। ওই দরুণ যে টাকা, মহিলার স্বামী (বেশির ভাগই গ্রামাঞ্চলের রোগী)পায় তার কাছ থেকে ডাক্তারবাবুদের দালাল টাকাসহ তাকে নিয়ে যায় ডাক্তারবাবুদের বলে দেওয়া মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের নির্দিষ্ট ওষুধের নির্ধারিত দোকানে। গ্রামাঞ্চলের ওই সব রোগিণীর আত্মীয়স্বজনদের নিম্নমানের ওষুধগুলি (চিটেগুড় মেশানো ভিটামিন টনিক, অ্যারারুট ও বেসন মেশানো ট্যাবলেট ক্যাপসুল) প্যাক করে পাওনা টাকাগুলি সব খরচ করিয়ে তবে ছাড়ে। বলাবাহুল্য, ওষুধের দামের মধ্যেই দালালরা নিজের কমিশন রেখে নেয়। এইভাবে চলে লাইগেসনের রোগিণীদের প্রেসক্রিপশান করা ও দালাল মারফৎ ঠিক করে রাখা নির্ধারিত দোকান থেকে ওষুধ দেওয়া। এতো গেল কোনও কোম্পানীতে কর্মরত মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের কোম্পানীর প্রতি বদান্যতা। ডাক্তারবাবুদেরও তারা খুশী করে চলে। কোম্পানীর তরফে প্রতিনিধিগণ ডাক্তার বাবুদের উপঢৌকন, নজরানা দিয়ে। ওষুধের মান যত নিম্ন হবে এবং যে ডাক্তারবাবু সেটি যতবেশী লিখবেন তাঁর অর্থকরী লাভ তত বেশি হবে।

একে তো স্বাস্থ্যব্যবস্থা, চিকিৎসা ভেঙ্গে পড়েছে তায় গোদের উপর বিশ্বফোঁড়ার ন্যায় সরকার আবার সাড়ে তিন বছরে ডাক্তার তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে। পাঁচ বছরের ডাক্তারদের চিকিৎসা বিভ্রাটের কথা সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখা যায়। এরপর জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার জন্য সাড়ে তিনবছরের ডাক্তারদের উপর ভরসা করা ছাড়া কোনো উপায় নাই। গ্রামের জনগণ সাবধান থাকুন, সহজে ডাক্তারের কাছে যাবেন না একেবারে নিরুপায় না হলে। আমাদের রাজ্যে শিক্ষায় স্বাস্থ্য চিকিৎসা পরিষেবায় পরিবর্তন আইন করে সংশোধন করা সম্ভব নয়। সরকার আরও একটি হাস্যকর আইন আনছে, ডাক্তারগণ যাতে ওষুধ কোম্পানীর অর্থে বিদেশযাত্রা না করতে পারে সেই সম্পর্কে।

—দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান।

মৃতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়

একটা ইন্দ্রপতন ঘটল। চলে গেলেন জ্যোতি বসু জ্যোতির্লোকে। Man wars not with Dead, তাই হাসপাতালে অন্তিম শয্যায় শয়ান জ্যোতি বসুকে একটি বার চোখের দেখা দেখতে ও তাঁর অন্তিম যাত্রায় অন্তিম শ্রদ্ধা আর গভীর, গভীরতর, গভীরতম শোক জ্ঞাপন করতে দলমত নির্বিশেষে সারা দেশের তাবড় তাবড় নেতানেত্রীবৃন্দ। এমনকী বিদেশেরও সকলেই ভদ্রতা, সেইজন্য আন্তরিকতাবশত (চক্ষুলজ্জাও বটে) ছুটে এসেছেন কলকাতায়।

কেন্দ্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আহি-নকুল সম্পর্ক গত শতাব্দীর সাতের দশক থেকেই। কোনও প্রধানমন্ত্রীর এ রাজ্যে শুভাগমন ঘটলে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু স্বয়ং অভ্যর্থনার জন্য যেতেন না বিমান বন্দরে। অথচ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জ্যোতিবাবুকে দু-দুবার দেখতে এলেন, বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে একই গাড়িতে জোটনেত্রীকে এড়িয়েই।

জীবনে জ্যোতিবাবু যাঁদের কভু দেননি মালা, তাঁরাই অর্থাৎ সেই সাম্প্রদায়িক বর্বর, বিদেশিনী, কেশাকর্ষণের যোগ্যা, বর্বর পার্টির সদস্যবৃন্দ সকলেই জ্যোতিবাবুর মরণে দিতে এলেন ফুল!! যেহেতু Man wars not with Dead.

জ্যোতিবাবু পশ্চিমবঙ্গের জন্য বিজ্ঞাপন-সর্বস্ব কিছু কাজ হয়তো করেছেন—যেগুলো মুখ্যমন্ত্রীর অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে তার অবদানের মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে সর্বভারতীয় স্তরে জনগণের জন্য তিনি কতটুকু করেছেন? কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে ভারত বিভাগ সমর্থন, চিরশত্রু চীনের সঙ্গে একাত্মতা, দেশবরেণ্য নেতাজী সম্বন্ধে অভদ্রজনোচিত উক্তি, হিন্দুত্বের অবমাননা, পোখরান-পরমাণু চুক্তির বিরুপ সমালোচনা। দলীয় স্বার্থ আদায়ে কেন্দ্রের সঙ্গে হাত মেলানো বামফ্রন্টের জ্যোতিবাবুর সম্মতিতে। এদিকে সাড়ে ২৩ বছরের রাজত্বকালে এই রাজ্যে তাঁর অপকীর্তির ইতিহাসতো সকলেরই জানা। সেই মরিচ ঝাঁপির নরমেধ যজ্ঞ থেকে আরম্ভ করে, সাঁইবাড়ি, বানতলা, ধানতলা প্রভৃতি। তাঁর আসলে প্রচার সর্বস্ব ভূমি সংস্কারের নামে অত্যন্ত গরীব ভূমিহীন কৃষকদের পুকুরপাড়, শ্মশান, গোচারণ ভূমি, দেবস্থান, ছোটখাটো ডোবা ইত্যাদি খাস জমির পাট্টা বিলিয়ে তাদের ভোট কিনে নেওয়া, আর ভোটের স্বার্থে মুসলমানদের তোষণ মূলক প্রতারণা, স্বাস্থ্যের বেহাল অবস্থা, প্রাইমারী থেকে ইংরেজী তুলে দেওয়া পরীক্ষা ব্যতীত পাশ চালু ইত্যাদি আরও কত কি? নারী ধর্ষিতা হলে "অমন কতই হয়" এই দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য। তবু জ্যোতিবাবু মহানেতা—তাই প্রমাণিত হলো—Man wars not with Dead.

বাস্তবিক পক্ষে জ্যোতি বসুর মৃত্যু হয়েছিল সেই ২০০০ সালেই, যেদিন তিনি ত্যাগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রিত্ব। কিন্তু কেন? তিনি সু-দূরদর্শী। বুঝতে পেরেছিলেন দলীয় নেতৃত্বের দাপট ক্ষীয়মান। অতীতে কেউ বিরোধিতা করলে দল থেকে বহিস্কার। কিন্তু অতি চতুর, ধড়িবাজ কতিপয় নেতার গতিবিধি আয়ত্বে রাখা তাঁর পক্ষে দুষ্কর। শেষ বয়সে মহা-কেলেঙ্কারী ঘাড়ে না চাপে এই কারণে "পদত্যাগ।" রাজকীয় হালে সর্বহারাদের নেতা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রাসাদে, অর্ধশত পরিচারক পরিচারিকার পরিসেবায় পরিসেবিত হয়ে ও বলবর্ধক, আয়ুবর্ধক খাদ্যাভ্যাসে দিনাতিপাত করেও কেন তাঁর ফুসফুস আক্রান্ত? আসলে তাঁর হাতে গড়া দলের, অনুগত শিষ্যদের যথেচ্ছাচার, অহমিকা, অভদ্র, অভব্য, অসভ্য, অশোভন, অসত্য কথন, উদ্ধত আচরণ ও বামফ্রন্টের অটল সৌধের আসন্ন পতন তাঁকে দেখতে হল—এই দুঃখ ও দুশ্চিন্তা ত্বরান্বিত করল তাঁর মৃত্যুকে।

—ধরণীধর মণ্ডল, কুতুবশহর, মালদা।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বেতন বৃদ্ধির জন্য নয়

নারায়ণ চন্দ্র দে

স্বস্তিকায় 'দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি' বিষয়ে এ পর্যন্ত দু'টি লেখা আমার চোখে পড়েছে। একটি গত ২৮ অগ্রহায়ণ দেবব্রত চৌধুরীর লেখা। অপরটি ২রা ফাল্গুন, ১৪১৬ হৃষীকেশ কর-এর লেখা। প্রথম জনকে চিনি। উনি বিজেপি-র নেতা। আর অপরজনকে আমি চিনি না। উনি কী পার্টি করেন তাও জানি না। তবে উনি যেমন পত্রিকার মাধ্যমে আওয়াজ তুলেছেন "সরকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রুখুন, নতুবা গদি ছাড়ুন", তাতে মনে হচ্ছে তিনি কোনও না কোনও পার্টির সক্রিয় সদস্য।

ঠিক সেই কারণেই রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি রাহুল সিন্‌হার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই কারণে যে এই দুই লেখকই প্রচণ্ড সরকারী কর্মচারী, ব্যাংকসহ সংগঠিত কর্মচারী বিদ্বেষী এবং ঈর্ষাপরায়ণ। এরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী আর্থিক ও শিল্পনীতিকে দায়ী না করে, দায়ী করেছে সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও ডি.এ. বৃদ্ধিকে। প্রথমজনকে সরাসরি লিখেছেন, বেতনবৃদ্ধি ঈর্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে'। অপরজন লিখেছেন, 'সরকারি, আধা সরকারি, ব্যাঙ্ককর্মচারীদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতি ছয়মাসে মূল্যবৃদ্ধি ভাতা বাড়ছে, সাধারণ লোকের প্রতি সরকার উদাসীন"। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে এই সমস্ত চিন্তাধারার কোনও যোগ নেই। এ সমস্তই হল সীমাহীন ঈর্ষা প্রসূত চিন্তা।

কি কেন্দ্রীয় নেতা, কি রাজ্যনেতা, যে যা খুশি বলে যাচ্ছে। নিজস্ব ভোটারদের আবেগের তোয়াক্কাও করছে না। ২০০৪ সালে নির্বাচনের ঠিক আগে বাজপেয়ী সরকার কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের পেনশনের অধিকার কেড়ে নিয়ে যে ভুল করেছিল, সেই নির্বাচনেই বিজেপিকে তার মাশুল গুণতে হয়েছিল। কয়েক বছর আগে তথাগত রায় এই স্বস্তিকার শারদীয়া পূজা সংখ্যাতেই লিখেছিলেন, 'বিজেপি'-র সঙ্গে কংগ্রেসের

জনমত

আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও প্রভেদ নেই। সেই সময় বামপন্থীরা সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে একথা প্রচার করে বাজিমাত করতে পেরেছিল সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে আমাদের সাংগঠনিক ভিত অনেকটাই তখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কারণ আমরা যতই বলি বি.এম.এস একটি অরাজনৈতিক বা নির্দলীয় শ্রমিক সংগঠন, সাধারণ মানুষ কিন্তু একথা বিশ্বাস করে না। তাই বিজেপি-র সরকারি, আধা সরকারি সংস্থার কর্মচারী বিরোধী কার্যকলাপের মাশুল আমাদেরও গুণতে হয়। বিজেপি-র উক্ত নেতাগণ কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের আর্থিক নীতিকে দোষারোপ না করে সরকারী কর্মচারিদের বিরুদ্ধে তা করছেন? সরকারি কর্মচারিদের ভোট কী বিজেপি-র প্রয়োজন নেই? তারা জানেন না সংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীরা আজ যে সমস্ত শ্রম আইনের সুফল ভোগ করছে তার পিছনে এক দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। আছে অজস্র মানুষের আত্মত্যাগের ইতিহাস। মালিক ও তাদের তাঁবেদার কংগ্রেস সরকার নিজের থেকে ভালবেসে বেতন কমিশন গঠন করেনি, ডি.এ রুল তৈরি

(এরপর ১১ পাতায়)

কারা-র শীতলা মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বাংলায় ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সাধারণত অনেককে স্মল পক্স বা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। ডাক্তার-বদ্যি থেকে এ রোগের উপশমের জন্য দৈব বা মা শীতলার কৃপার উপরই মানুষ নির্ভর করে। এ সময়ে তাই বাংলায় পাড়ায় পাড়ায় বা গ্রামে গ্রামে শীতলা পুজো হয়ে থাকে। তবে শুধু বাংলায় নয়, ভারতের অন্যত্রও শীতলা দেবীর মন্দির রয়েছে। যেমন রয়েছে উত্তরপ্রদেশের কৌশাম্বী জেলার কারা শহরে। কারা শহরটা পুরানো। শহরের পাশ দিয়েই গঙ্গা বইছে। এই শহরের গঙ্গার ধারেই রয়েছে শীতলা দেবীর মন্দির। মেডিকেল সায়েন্স বলছে, বসন্ত রোগে চোখ নষ্ট হয়ে গেলে তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু লোকের বিশ্বাস, মা শীতলাদেবীকে পূজা দিলে সেই অসম্ভবও সম্ভব—দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া যায়। কারার শীতলা মন্দিরে তাই সারা বছরই ভক্তদের ভীড়।

এই মন্দিরটি ভারতের ৫১তম শক্তিপীঠ। এই শহরেই রয়েছে কালেশ্বর মহাদেবের মন্দির। পূর্বে এই শহরটির নাম ছিল কালনগর বা কারকোটাক নগর। কথিত আছে, শিবের স্ত্রী সতীর হাতের করতল (হিন্দীতে কর) এই অঞ্চলে পড়েছিল বলে অনেক এটি কারাকোটাক নগর বলে। এই পীঠকে সিদ্ধ পীঠও বলা হয়ে থাকে। দিল্লী সুলতান বংশের ধ্বংসাবশেষ এই অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ১০০০ খ্রীষ্টপূর্ব সময়কাল থেকে এই মন্দির শহরটি তীর্থযাত্রীদের কাছে দর্শনীয়। কনৌজ বংশের ধ্বংসাবশেষ আমরা এই অঞ্চল থেকে পেয়ে থাকি। সেই বংশের শেষ রাজা ছিলেন রাজা জয়চন্দ।

পরম্পরা

জনশ্রুতি হলো, এই মন্দিরের পূজারীকে বিনা দোষে এক উচ্চজাত পরিবার শাস্তি দেন। পূজারী তখন দেবীকে এই অন্যায়ের বিচার করতে বলেন। কিছুদিন পর দেখা গেল সেই পরিবারের তিন ছেলের অকস্মাৎ মৃত্যু হলো। পরবর্তীকালে পরিবারটি তাদের নিজস্ব ভুল বুঝতে পারেন। ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তারা মন্দিরে এসে উপস্থিত হন। পণ্ডিত ধরণী মিশ্রের মতে দেবী শীতলামাতাকে অগাধ ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী জেনেও তার প্রতি সেই পরিবারের যেন একটু অবজ্ঞার ভাব ছিল। অনেকটা আমাদের চাঁদ সওদাগরের মতো। ফলে চাঁদ সওদাগরের মতো এই পরিবারকেও দুঃখ ও শোক ভোগ করতে হয়। পণ্ডিত মিশ্রর মতে প্রত্যেক দেব-দেবীর তাদের নিজস্ব বাহন থাকে। দেব-দেবীদের এইসব বাহনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সিংহ, ঘোড়া , পেঁচা, ইঁদুর, হাতী ইত্যাদি। ঠিক তেমনিই শীতলামাতার প্রধান বাহন গাধা। এই বাহনে চেপেই দেব-দেবীরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করে থাকেন। প্রত্যেকের বাহন তারা নিজেরাই ঠিক করে। সে যাই হোক না কেন, এই জগৎ মূলে যেহেতু তাঁরই সৃষ্টি, তাই বাহন যে প্রাণীই হোক না কেন, তাতে কোনও অসুবিধা হয় না। এই কারা-মন্দিরকে ঘিরে বহু ছোটোখাটো কিংবদন্তী বা কাহিনী প্রচলিত আছে। এই মন্দিরকে অনেকে নিজস্ব ইচ্ছাপূরণের স্থান বলেন। পূজারীর মতে এই মন্দিরের ভিতর একটি ছোট কুণ্ড আছে। সেখানে ভক্তরা তাদের নিজস্ব ইচ্ছাপূরণের পর সেখানে জল ঢালেন এবং মা'র আশীর্বাদ লাভ করেন। কিন্তু যারা ভগবানে বিশ্বাসী নন তাদের ঘড়া ঘড়া জলেও লাভ হয় না। এখানে ভক্তরা বিভিন্ন জেলা এবং বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসে উপস্থিত হন। কারণ তাদের মনের যা ইচ্ছা তা যেন মায়ের দর্শনে পূরণ হয়। এখানে মাতা রোগ নিরাময়কারী হিসাবেও প্রসিদ্ধ । বসন্ত রোগ এবং অন্যান্য অসুখ-বিসুখ এখানে এলে নিরাময় হয়, ভক্তদের তেমনই বিশ্বাস। ইচ্ছাপূরণ হলে তারা মাতাকে সোনার চোখ বা রুপোর চোখ প্রদান করে থাকেন। কথিত আছে, অনেকদিন আগে এক বালক তার চোখের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে বসন্ত রোগের কারণে। ফলে ছেলেটির মা মন্দিরে এসে শীতলা মাকে বলেন, তার ছেলে যদি দৃষ্টি ফিরে পায় তাহলে তিনি মাকে সোনার চোখ প্রদান করবেন। পরবর্তীকালে ছেলেটি তার নিজের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। তার মা প্রতিশ্রুতিমতো দেবীকে সোনার চোখ দিয়ে পুজো দেন। সেই থেকে আজও ইচ্ছাপূরণ হলে ভক্তরা সোনার বা রুপোর চোখ দেবীকে নিবেদন করে।

বাহন গর্দভের পিঠে মা শীতলা

শংকরদেব কলাক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বৈষ্ণবগুরু শংকরদেব অসমের ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা পুরুষ। তাঁর নির্দেশিত নামঘর অসমের সর্বত্র। তাঁরই পথনির্দেশ অনুসারে অসমে গড়ে উঠেছে কলাক্ষেত্র যা শাস্ত্রীয় ধ্রুপদী নৃত্য-গীত-নাট্য চর্চার পীঠস্থান। সম্প্রতি ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে গুয়াহাটি শংকরদেব কলাক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কলাকুশলী-শিল্পীরা একত্রিত হয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন করেন। তাদের মধ্যে জাভা, বালী, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। জাভার শিল্পীদের ভারতীয় নৃত্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বেতন বৃদ্ধির জন্য নয়

(১০ পাতার পর)

করেনি। আজ বথ-র চাপে দেশী-বিদেশী বণিকদের স্বার্থে সরকার শ্রম আইন তুলে দিতে চাইছে? তারই বিরুদ্ধে বি.এম.এস লড়াই করছে নিরন্তর। বিজেপিও কী কংগ্রেসের মতো শ্রম আইন তুলে দিয়ে সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের অসহায় করে তুলতে চায় ৫০ বছর আগের মতো?

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে এক আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। আমেরিকার চাপে কংগ্রেস সরকার একের পর এক দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করছে। এর ফলে দেশের বাজারে আমদানী শুল্কহীন সস্তা বিদেশী দ্রব্য (এমন কী কৃষিজাত দ্রব্য পর্যন্ত) ছেয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিবিরোধী নীতির ফলে দেশীয় কৃষিজাত দ্রব্য বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। শিল্পেরও একই অবস্থা। SAIL উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে অনেক কম দামে ইস্পাত বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু আমার দেশের বাজার চিরকালই সস্তা। আমাদের দেশ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে low-cost economy, সেই কারণে বিদেশী দেশগুলোও এত সস্তা দরে বেশিদিন বাণিজ্য করতে পারছে না। তাই দেশের বাজারকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে ড়ন্ধড়-ন্তুপ্সদ্দব্ধ করে তোলার চেষ্টা করছে।

বার্ড-ফ্লু'র মিথ্যা প্রচার করে করে মুরগীর কাটা মাংস প্রতি কেজি ১৬০ টাকায় তুলে দিয়েছে। দু-এক বছর আগেও যা ছিল মাত্র ৩০-৩৫ টাকা। আমেরিকার Kentaki Chicken তা না হলে বাজার দখল করতে পারছিল না। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীরব দর্শকের ভূমিকা থেকে তা কি প্রমাণ হচ্ছে না?

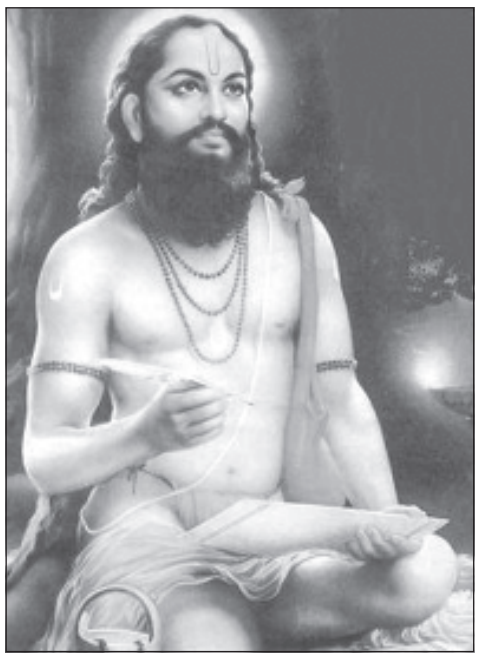

স্বামী রামদাস

একবার স্বামী রামদাসজী ভিক্ষা করতে করতে এক বাড়ীর সামনে এসে উপস্থিত হন। এবং উচ্চস্বরে ডাকলেন—রঘুবীর সমর্থ। ঘর থেকে এক মহিলা বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং তার ঝোলার মধ্যে ভিক্ষা নিবেদন করে বলেন, স্বামীজী কোনও উপদেশ দিন।

স্বামীজী বলেন, আজ নয় কাল দেব। দ্বিতীয় দিন স্বামীজী আবার সেই ঘরের সামনে এসে ডাক দেন—রঘুবীর সমর্থ। মহিলাটি ওই দিন তার ঘরে ক্ষীর বানিয়েছিলেন। যার মধ্যে পেস্তা, বাদামের মতো দামী জিনিসও ছিল। তিনি ক্ষীরের বাটি হাতে নিয়েই বাইরে আসেন। স্বামীজী তা দেখে নিজের কমণ্ডলু এগিয়ে দেন। মহিলাটি যখন তার মধ্যে ক্ষীর ঢালতে গেলেন, তখন তিনি দেখলেন কমণ্ডলুর মধ্যে দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা ভরা রয়েছে। ফলে, তাতে ক্ষীর দিতে মহিলাটি ইতস্তত করেন। তিনি বলেন, মহারাজ এই কমণ্ডলুতে আবর্জনা ভর্তি রয়েছে।

স্বামীজী বলেন, হ্যাঁ আবর্জনা তো আছে। কিন্তু ক্ষীর তুমি এখানেই ঢেলে দাও।

মহিলাটি বলেন, না মহারাজ, তাহলে তো সমস্ত ক্ষীর নষ্ট হয়ে যাবে।

আপনি আমাকে এই কমণ্ডলুটি দিন। আমি ধুয়ে নিয়ে আসি। স্বামীজী বলেন "তার মানে এই কমণ্ডলু পরিস্কার হলে তাহলেই তুমি এতে ক্ষীর ঢালবে?" মহিলাটি উত্তর দেন—হ্যাঁ।

বোধ কথা

স্বামীজী বলেন, আমারও উপদেশ হলো যে তোমার মনে যতক্ষণ চিন্তার আবর্জনা, ময়লা এবং খারাপ সংস্কারের নোংরা ভর্তি থাকবে, ততক্ষণ তোমাকে উপদেশামৃত দিয়েও কোন লাভ হবে না। যদি উপদেশামৃত পান করার ইচ্ছে থাকে তাহলে সর্বপ্রথম নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। কু-সংস্কারকে বর্জন করতে হবে, তাহলেই তোমার সত্যিকারের সুখ ও আনন্দ প্রাপ্তি হবে।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

স্বস্তিকার দাম

প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য

সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর।।

শেক্সপীয়ার নাটক রহস্য

বৃটেনের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডকে নিয়ে লেখা 'দ্য রেইন অব্ কিংএডয়ার্ড থ্রি' নাটকের লেখক কে? বিতর্ক ছিল, নাটকটি শেক্সপীয়ার একা লেখেননি, তাঁর সহলেখক ছিলেন নাট্যকার টমাস কিড। চার শতাব্দী ধরে চলা এই রহস্যের যবনিকাপাত হয়েছে বলে দাবী করেছেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার ব্রায়ান ভিকার্স ও তাঁর সহযোগী গবেষকেরা। একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামের সাহায্যে স্যার ভিকার্স অ্যাভনে কবির ভাষা পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, জানাচ্ছে 'দ্য টাইমস্'। ১৫৯৬ সালে নাটকটি যখন প্রকাশিত হয়, শেক্সপীয়ারের বয়স তখন ৩২। এর আগের লেখাগুলি মিলিয়ে দেখা যায়, দুটি লেখার মধ্যে প্রায় ২০০টি একই ধরনের মিল রয়েছে। স্যার ব্রায়ান বলেছেন, 'দুই পৃথক লেখকের রচনায় ১০ থেকে ২০টি একই বাক্যাংশ থাকতে পারে, কিন্তু ২০০টি মিল পাওয়া গেলে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, দুই লেখকের গুণমানের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ওই নাটকের ৬০ শতাংশ লিখেছেন কিড, বাকি ৪০ শতাংশ শেক্সপীয়ারের লেখা।

জলতলে এক হবে দুই করতল

আকাশে পাণিগ্রহণের পর এবার জলতলে বর-কনে, পুরুত-নাপিত—সবাইকে নিয়ে যাবেন মুম্বই-প্রবাসী বাঙালি ডুবুরি প্রদীপ দে। মালাবদল তো হবেই, উচ্চারিত হবে পবিত্র বিবাহমন্ত্রও। এহেন উদ্ভট বিয়ে ভারতে এই প্রথম নয়। বছর আটেক আগে নৌবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার ক্যাপ্টেন পার্থ দাস মুম্বই মেরিন সেন্টারের সুইমিং পুলের জলের নিচে বিয়ের পর্বটি সেরে ফেলেছিলেন। এবারের বিয়ে-পর্ব সাঙ্গ হবে বেলেঘাটার সুভাষ সরোবরে। বর-কনে পাতালে গিয়ে বিয়ে করতে রাজি হলেই বিয়ের পুরো খরচ এবং আনুষঙ্গিক সব দায়-দায়িত্ব প্রদীপ দে-এর নিজের। বছর পঞ্চাশের তরুণ তুর্কি সমুদ্রের গভীরে বহুবার গিয়েছেন কাজের সুবাদে। অ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপারটা ছিল বলেই তিনি ডুবুরি হয়েছিলেন। জলের নিচে বিয়ের আয়োজন, সেও তো একরকম অ্যাড্‌ভেঞ্চারই। এবং ঘটক হওয়াটাও।

বিচিত্র আঁধার

১৭৮০ সালের ১৯ মে, নিউ ইংল্যান্ডে সকাল এসেছিল আরও শত সহস্র সকালের মতনই। ঘড়িতে তখন দশটা। কাজের মানুষেরা কেউ কেউ ঘর ছেড়েছেন, কেউ বা তৈরি হচ্ছেন। এমন সময় আকাশের আলো গেল কমে। সন্ত্রস্ত কৌতূহলী যাঁরা, তাঁরা বিস্ময়ে আকাশে তাকালেন। ছিটেফোঁটা মেঘ নেই, বাতাসে কুয়াশা নেই। এদিকে সময় যত গড়িয়ে যায়, অন্ধকারও গাঢ় হতে থাকে। দিনদুপুরে ঘরে ঘরে বাতি জ্বলে উঠল। এই অদ্ভুত আঁধার চালু ছিল প্রায় ২৪ ঘণ্টা। কিন্তু কী কারণে ওই শহরটি সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, বিজ্ঞানীরা হাজার চেষ্টাতেও জানতে পারেননি। ১৭৮০ সালের ১৯ মে কোনওরকম সূর্যগ্রহণও হয়নি।

।। চিত্রকথা ।। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।। ২

দাদা বিশ্বরূপের সঙ্গে নিমাই অদ্বৈত গোঁসাই-এর টোলে পড়তে গেলেন।

নিমাই-এর উপনয়ন হচ্ছে। নেড়া মাথা ও ব্রহ্মচারীর বেশ।

নিজের গ্রন্থ গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে পাণ্ডিত্যের অহংকার ত্যাগ করলেন।

'গীতা প্রেস' গোরক্ষপুর-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

(চলবে)

র ঙ্গ কৌ তু ক

প্রশ্ন ঃ সুতো ঝোলাবার জন্যে একটা ঢিল কোথায় পাই বল্‌তো?

উত্তর ঃ যেখানে দুটো পাখি মরে আছে দেখবি, তারই কাছাকাছি একটা ঢিল পেয়ে যাবি।

* * *

ছেলে ঃ মা দ্যাখো, একটা বোরখা কিনলাম।

মা ঃ তুই না ব্যাটাছেলে, বোরখা পরে কী করবি?

ছেলে ঃ কেন লেডিস স্পেশালে বসে অফিস যাব!

* * *

শিক্ষক ঃ নাম কী?

ছাত্র ঃ রবি

শিক্ষক ঃ নাম বলার আগে স্যার বল্‌তে হয় জানিস না?

ছাত্র ঃ সরি, স্যার;স্যার রবি।

* * *

রঞ্জন ঃ মা বলেছে এমন কিছু কর যাতে দেশে তোর নাম থেকে যায়।

অঞ্জন ঃ তুই কী করবি ভেবেছিস?

রঞ্জন ঃ ভাবছি এবার ভোটে দাঁড়াব। তাহলে আমাদের দেয়ালে নিজের নামটা অন্তত পাঁচ বছর থেকে যাবে!

* * *

শিক্ষক ঃ কীরে, খাবার আগে রোজ প্রার্থনা করতে বলেছিলাম, করিস তো?

ছাত্র ঃ না স্যার, আমার মা তো ভালই রান্না করে।

—নীলাদ্রি

ম গ জ চ র্চা

১। তিন অক্ষরের মৎস্যটি/নদীর জলে বাস,

পেট কাট্‌লে পক্ষী হতে/দেয়না অবকাশ—কী মাছ?

২। তিব্বত ও চীনা ভাষায় 'মাপান ইয়ামখো' বা 'মা-ফা-মুৎস'-কে কোন্ নামে আমরা বেশি জানি?

৩। ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ কাকে বলা হয়?

৪। কলকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কে?

৫। কোন্ মরুভূমির নামের মানে হিন্দি ভাষায় সাহায্য?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। ইলিশ।

২। এভারেস্ট।

৩। রাজা রামমোহন রায়।

৪। ওয়ারেন হেস্টিংস।

৫। সাহারা।

প্রয়াত স্বয়ংসেবক স্বপন সরকার স্মরণে

‘সঙ্ঘকে দিতে হয়, সঙ্ঘ থেকে নিতে নেই’

অশোক ভক্ত ।। মেদিনীপুর শহরের পাহাড়িপুরে, আঢ্যিদের ডাঙ্গায় বেশ কিছু ছেলে অনেক রকম নতুন নতুন খেলাধূলা করছিল। মাঝে মাঝে পায়ে পায়ে তাল মিলিয়ে প্যারেড্। তারপর সবাই মিলে গান, প্রার্থনা। একটি ছেলে এতক্ষণ খেলাধূলা পরিচালনা করছিল। মনে হ’ল ওই ওদের ক্লাবের ক্যাপটেন্। কিছুদিন পরে আমার এক সহপাঠী বললো—খেলতে যাবি? গেলাম (বল্লভপুরে)। সেখানে আবার সেই ক্যাপটেনকে দেখলাম। পরিচয় হ’ল। জানলাম—উনি স্বপনদা। স্বপন সরকার। না! শ্রী স্বপন সরকার। মেদিনীপুর টাউন স্কুলের কৃতী ছাত্র। উনি শিখিয়েছিলেন—নামের আগে ‘শ্রী’ বলতে হয়। আর জানলাম—আমরা মিলিত হয়েছি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখায়।

বাড়ির প্রবল সঙ্ঘ বিরোধিতা সত্ত্বেও কখনও তাঁর হাসি মুখ ম্লান হ’তে দেখিনি। বাড়িতে গেলেই হাসিমুখে আদর করে ভেতরে নিয়ে বসাতেন। কত গল্প করতেন। প্রায়ই স্বয়ংসেবকদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে খবরাখবর নিতেন। পড়াশুনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেন। কোনও বিষয়ে অসুবিধা থাকলে বুঝিয়ে দিতেন।

চাকুরি থেকে অবসরগ্রহণের পর, শেষের দিকে তাঁর শরীরে শর্করার মাত্রা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধির কারণে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু মুখ দেখে বুঝবার উপায় ছিল না যে তিনি কতটা অসুস্থ। ছোটবেলা থেকে যা দেখে এসেছি, সেই হাসিটুকু তাঁর মুখে সর্বদা লেগেই ছিল। তাঁকে কখনও রাগ করতে দেখিনি। রাগের ভান করলেও ধরা

স্বপন সরকার

পড়ে যেতেন। যারপরনাই অসুস্থ অবস্থাতেও নিজের হাতেই নিজের সব কাজ করতে চাইতেন।

গত ৮ ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় নিঃশব্দে অমরলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। আমাদের জন্য পাথেয় হিসাবে রেখে গেলেন—ঘরে বাইরে শত বিরোধিতা সত্ত্বেও সঙ্ঘকার্যের অদম্য প্রেরণা আর তাঁর সেই মিষ্টি মধুর হাসির স্মৃতি।

লহর মজুমদার ।। স্নাতক হওয়ার পরে পরেই স্বপন সরকার সঙ্ঘের প্রচারক হন। দশ বছর প্রচারক কালে বীরভূম, বেহালা, কাটোয়া, শিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থানে প্রচারক হিসেবে কাজ করেন।

প্রচারক জীবন থেকে ফিরে উনি “শিবপুর শিক্ষালয়ে” শিক্ষকতা করেছেন, পরে রিষড়াতেও কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন। সেই সময় জরুরী অবস্থা (১৯৭৫ সালে) জারি হওয়ায় সঙ্ঘের আহ্বানে উনি সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন। ফলে রিষড়ার শিক্ষকতার কাজ চলে যায়। পরে তিনি গান্ধী মেমোরিয়াল অ্যান্টি লেপ্রসি ফাউন্ডেশান, ওয়ার্ধাতে যোগদান করেন। সেখানে দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর যথেষ্ট কৃতিত্বের সাথে কাজ করেন এবং অবসর নেন।

স্বপনদা ব্যক্তিগতভাবে খুব স্বাধীনচেতা ছিলেন, অকৃতদার ছিলেন, আদর্শের প্রতি ছিল অবিচল নিষ্ঠা। ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ইংরেজী ভাষায় স্বচ্ছন্দে লিখতে ও বলতে পারতেন। একসময় ঞ্জন্দ্রন্দদ্বজ-এ লেখার কাজেও আহ্বান পেয়েছিলেন। শারীরিক খুব কষ্ট থাকলে নিজের কাজ সবসময় নিজে করতেন।

উনি যে কথা প্রায়ই বলতেন—‘সঙ্ঘকে কেবল দিতে হয়—সঙ্ঘ থেকে নিতে নেই।” আদর্শ স্বয়ংসেবকের ব্যবহার তাঁর ছিল। তাঁর অমর আত্মার শান্তি কামনা করি—ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

শোক সংবাদ

গত ২০ জানুয়ারি আসানসোল জেলা সম্পর্ক প্রমুখ জুগল কিশোর সিংয়ের পিতৃদেব ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। জুগল কিশোর সিং ছাড়া আরও তিন ছেলে সকলেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক।

*　　*　　*

কানাইলাল দত্ত গত ৯ ফেব্রুয়ারী ৮৬ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। কানাইবাবু পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের আশ্রয়স্থল, নববারাকপুর উপনিবেশ-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এর কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। সদালাপী, সদাহাস্যময় কানাইবাবু, নববারাকপুরের ‘সাহিত্যিকা’, রামকৃষ্ণ পাঠাগার, হরিপদ বিশ্বাস প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, নববারাকপুর শিক্ষা সমাজের প্রাণপুরুষ ছিলেন। স্বস্তিকার একান্ত অনুরাগী গ্রাহকও।

*　　*　　*

উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সহব্যবস্থা প্রমুখ তপন কুমার দাসের মাতৃদেবী ঊষারাণী দাস গত ১২ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র এবং পাঁচ কন্যা রেখে গেছেন।

*　　*　　*

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের দক্ষিণপূর্ব কলকাতা শাখার কর্মী দেবযানী রায় গত ৭ ফেব্রুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।

*　　*　　*

বর্ধমান নগরের সঙ্ঘের শ্রীকৃষ্ণ প্রভাত শাখার মুখ্যশিক্ষক চন্দন সাহার পিতৃদেব চিত্তরঞ্জন সাহা গত ১১ ফেব্রুয়ারি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। দুই পুত্র দুই কন্যাসহ নাতি-নাতনিরা বর্তমান।

*　　*　　*

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রাক্তন সহ জেলা সঙ্ঘচালক মানিকচন্দ্র দাসের পত্নী শ্রীমতী দুর্গা দাস গত ২৫ জানুয়ারি দীর্ঘ রোগভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৭৫ বৎসর বয়সে। তিনি ছিলেন কোদালিয়া গার্লস হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষিকা। বারুইপুরে তাঁর বাসভবনের নিচের তলা ছাড়া দোতলা, তেতলা ও সামনের ফাঁকা জায়গা সবই লায়ন্স ক্লাবকে চক্ষু হাসপাতালের জন্য দান করেছেন। মানিকচন্দ্র দাস সম্পাদিত অভিযাত্রী পত্রিকার তিনি ছিলেন প্রকাশিকা ও অন্যতম নিয়মিত লেখিকা। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, দুই পুত্র ও পুত্রবধূ এবং তিন পৌত্রী রেখে গেছেন।

*　　*　　*

বাঁকুড়া জেলার রামনগর নিবাসী দেবীচরণ রায় গত ১২ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেছেন। তিনি কিডনীর অসুখে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে দুই পুত্র ও সহধর্মিনীকে রেখে গিয়েছেন। তাঁর পুত্র তাপস রায় সঙ্ঘের বিষ্ণুপুর মহকুমার সহ-কার্যবাহ।

সমাবেশ সমাচার

কেশবচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতির স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

গত ২০ ফেব্রুয়ারি কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী হিল্লোল ক্লাব সংলগ্ন স্থানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হয়। এই শিবিরে কার্ডিওলজির ১১১ জন, নেপ্রোথলজির ৪৩ জন এবং ইউরোলজির ২৯ জন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ টেগোর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিয়াক সায়েন্স (মুকুন্দপুর, কলকাতা) এই শিবিরকে সফল করার জন্য সহযোগিতা করে।

মুসলিম সংরক্ষণের বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভা

সংবাদদাতা ।। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরকারী চাকুরিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য যে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ দেবার কথা ঘোষণা করেছেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা ওই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করছে। হিন্দু মহাসভা মনে করে যে রাজ্য সরকারের ওই তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত, আগামী ২০১০ এর পৌর-নির্বাচন ও ২০১১’র বিধানসভা নির্বাচনে মুসলিম ভোট নিজেদের পক্ষে টানার লক্ষ্যে করা হয়েছে। ওই সংরক্ষণের কূটকৌশলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অশনি সংকেত দিচ্ছে যার ফলে আগামীদিনে তথাকথিত সেকুলারবাদী দলগুলির মধ্যে মুসলমান তোষণের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। যার সুদূর প্রসারী ফল হিসাবে অদূর ভবিষ্যতে বিধানসভা ও অন্যান্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের দাবী উঠবে। যেহেতু বর্তমানে ও.বি.সি. কোটার মধ্যে রাজ্যে ২.৪ শতাংশ মুসলিম অনগ্রসর গোষ্ঠীর সংরক্ষণ ছিলই, তাই রাজ্য সরকারের বর্তমানে মুসলিমদের জন্য মোট ১২.৪ শতাংশ সংরক্ষণের সৃষ্টি করলো যা অন্যান্য অচিহ্নিত ও.বি.সি. গোষ্ঠিকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে। ধর্মের ভিত্তিতে এই সংরক্ষণের প্রচেষ্টা অবৈধ, অযৌক্তিক এবং ভারতীয় সংবিধানে অনুসৃত ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতির পরিপন্থী।

বঙ্গম

সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে সংস্কার ভারতীর বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান

নীলাঞ্জনা রায় ॥ বাংলার সামাজিক তথা আধ্যাত্মিক জীবনে কীর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বর্তমানে এই ধারাটির প্রচলন ও চর্চা হ্রাস পাচ্ছে। সংস্কার ভারতীর প্রয়াস ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা।

সঙ্গীত কর্মশালা

এই চিন্তা থেকেই সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০ অনুষ্ঠিত হলো একটি কীর্তন বিষয়ক কর্মশালা। কলকাতাস্থিত নরেশ ভবনে রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপিকা, বেতার ও দূরদর্শন শিল্পী কীর্তন ভারতী শ্রীমতী কল্পনা সাহা দুইদিন ব্যাপী কর্মশালাটি পরিচালনা করেন। কীর্তনাঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাদ্য সহযোগ শ্রীখোল। এই শ্রীখোল বাদক হিসাবে ছিলেন নবদ্বীপ থেকে আগত শ্রীনবগৌর দাস। সহযোগিতায় ছিলেন শ্রীসুনীল শীল এবং শ্রীমতী অনিতা শিকদার। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শ্রীঅমল সাহা।

শিল্পী প্রথাগত ভাবে 'গুরুবন্দনা' এবং 'গৌর মহিমা' দিয়ে কর্মশালার সূচনা করেন। শ্রীমতী কল্পনা সাহার গায়কীতে চিরায়ত প্রাচীন কীর্তনের ভাবটিই প্রকাশ পেল। দুইদিনের কর্মশালার জন্য দুইটি পূর্বনির্দিষ্ট কীর্তন পর্যায়ের বিষয় ছিল— 'রাধার পূর্ব রাগ' এবং 'শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা'। এই দুইটি ছিল যথাক্রমে ছয়মাত্রিক 'লোফা' এবং ১৬ মাত্রিক 'দাসপেড়ে' তাল ভিত্তিক।

মূল পদ এবং 'আখর' অর্থাৎ কীর্তনের পদের বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে শিল্পী সমবেত সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। সংস্কার ভারতীর বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিল্পীরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে মনোজ্ঞ প্রশিক্ষণ পর্বটিতে অংশগ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন সঙ্গীত অংশের মধ্যে দিয়ে তিনি সোম, মধ্যম, দশকুশি, তেওড়, চঞ্চু পুট ইত্যাদি তালের প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

প্রশিক্ষণ পর্বে তিনি বার বার উল্লেখ করেন যে যথার্থ কীর্তন শিল্পীর প্রয়োজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিক্ষা। তাঁর কণ্ঠের বিভিন্ন তালের প্রয়োগেও বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

শ্রীকৃষ্ণের দানলীলা পর্বে যখন শিল্পী মূল বিষয়টি উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করছেন যে গৌরহরি ভক্তবৃন্দকে সমস্ত মন প্রাণ তাঁর চরণে সমর্পণের কথা বলেছেন, তখন সত্যই সমবেত সকলে ভক্তিভাবে আপ্লুত হন। সমবেত হরিধ্বনির সঙ্গে যখন অনুষ্ঠানটি শেষ হয় তখন যথার্থই একটি কীর্তন আসরের রেশ থেকে যায়।

কীর্তনের এই কর্মশালা থেকে কীর্তনাঙ্গিকের একটি প্রাথমিক ধারনা সকলে পেয়েছেন। কর্মশালায় আগত ৪৫ জন শিল্পী আগামীদিনে কীর্তন চর্চার অনুপ্রেরণা নিয়ে ফিরে যান।

ভরতমুনি জয়ন্তী

গত ৩০শে জানুয়ারি কলকাতায় কেশবভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হল আর একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। ভারতের আদি নাট্য শাস্ত্রকার ভরতমুনির স্মরণ।

এই অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন চন্ডীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর কলেজের দর্শন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক। তিনি বলেন, সমাজজীবনে নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব কালজয়ী। সুতরাং নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনির অবদান বর্তমানকালেও সমান প্রাসঙ্গিক। সমাজ-জীবনে যে সব ঘটনা আমরা দৈনন্দিন সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পারি তার প্রভাব আমাদের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যখন কোনও একটি ঘটনা নাট্যরূপের মাধ্যমে আমাদের সামনে মঞ্চ স্থ হয়, তার প্রভাব দর্শকমনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। নাট্যরচনা ও তার মঞ্চ নের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার সম্ভব। এইরূপ একটি মাধ্যমের যিনি আদি রূপকার সেই ভরতমুনির জয়ন্তী উদযাপন ভারতবাসী হিসাবে আমাদের কর্তব্য।

এদিনের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে সংস্কারভারতী দক্ষিণবঙ্গের সোনারপুর এবং উত্তরপাড়া শাখা দুইটি শ্রুতি নাটক প্রস্তুত করেন। শ্রীসমরেশ রাহা রচিত ও সোনারপুর শাখা অভিনীত নাটক 'অলিভিয়া নয় অরুন্ধতী' নাটকের বিষয় ছিল আজকের প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় অভিভাবক এবং ছাত্র-ছাত্রী কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার একটি চিত্র। প্রধান চরিত্র চিত্রনে ছিল রাজীব, অন্তিমা এবং অনিন্দিতা। অন্য ভূমিকায় ছিলেন শ্যামলশংকর নন্দী ও অমিতাভ মুখার্জী।

উত্তরপাড়া শাখার প্রীতি চট্টোপাধ্যায়, প্রলয় ভট্টাচার্য্য ও সরোজ মান্না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এদিন সংস্কার ভারতী মেদনীপুর শাখা সিপাহীবাজার শিম্যমন্দিরে বিকাশ ভট্টাচার্য রচিত 'রাজযোগী' নাটকটির পাঠাভিনয় করেন। অভিনয় করলেন রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর অংশ বিশেষ।

বৈজু বাওরা রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত মহোৎসব

ভারতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে সাত্ত্বিকতার জাগরন ঘটিয়ে বিশ্বশান্তি এবং পরম বৈভবের কামনায় গত ৫, ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি

সংস্কার ভারতীর কীর্তন বিষয়ক সঙ্গীত কর্মশালা। ছবি ঃ শুভঙ্কর মুখার্জী

মধ্যপ্রদেশের ভূপালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তানসেন ও বৈজু বাওরা বন্দাবনের সঙ্গীতাচার্য স্বামী হরিদাসের শিষ্য ছিলেন। দুই শিষ্যের মধ্যেই গঠনাত্মক প্রতিযোগিতা হ'ত। এবং তানসেন পরাজিত হতেন। ধ্রুপদসঙ্গীতের দুই প্রতিভার স্মরণে আয়োজিত হয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এই মহোৎসব। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সংস্কার ভারতীর শিল্পীরাই এই উৎসবে অংশ নেন। পশ্চিমবঙ্গের জিয়াগঞ্জের নবীন প্রতিভা আকাশ রায় বেহালা বাদনে এবং কলকাতার কৌশিক মুখোপাধ্যায় সরোজ বাদনে উপস্থিত সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। উদ্বোধন করেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংচৌহান।

গুনীজন সম্বর্ধনা

বাংলা কাব্যসঙ্গীতে, বিশেষতঃ চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের রোমান্টিক গানের স্বর্ণযুগের যে মুষ্টিমেয় ক'জন গীতিকার-সুরকার আজও সমান ক্রিয়াশীল তাঁদের মধ্যে অন্যতম অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি ২৭ জানুয়ারি সুজাতাসদনে সংস্কার ভারতীর দক্ষিণ কলকাতা শাখা এই গুণী শিল্পীকে সম্বর্ধনা জানায়। সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে শিল্পী সংস্কার ভারতীর বিভিন্ন গঠনমূলক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে স্মিতশ্রী চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বাংলা কাব্যসঙ্গীতর এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়।

বিধায়ক ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা

বিশিষ্ট নাট্যকার নির্দেশক-অভিনেতা বিধায়ক ভট্টাচার্য স্মরণে সংস্কারভারতী প্রতিবছর একটি নাট্যবিষয়ক বক্তৃতার আয়োজন করে আসছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ সভাঘরে 'অভিনেতার প্রস্তুতি' বিষয়ে বলেন রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তন নাট্য বিভাগীয় প্রধান বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব অশোক মুখোপাধ্যায়।

শব্দরূপ - ৫৩৯

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

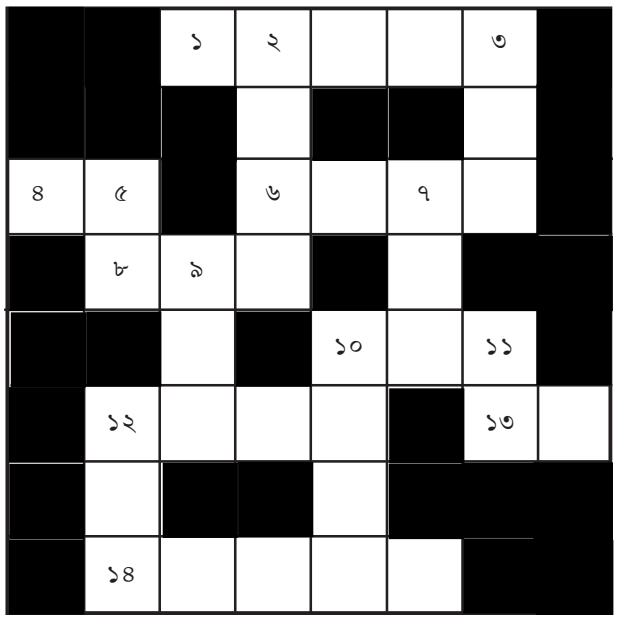

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. অন্য উপায়ে, ভিন্ন রকমে, ৪. বিষ্ণু, ৬. কুশধবজ রাজার কন্যা;রাবণ বর্ধার্থে ইনিই পরজন্মে সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেন, ৮. দশমহাবিদ্যান্তর্গত দেবী বিশেষ, ১০. বর্ম্ম;সাঁজোয়া, ১২. গঙ্গার মর্ত্যে আগমন দিন, ১৩. দোমালা নারিকেল, ১৪. জোনাকিপোকা;প্রথম দুয়ে একটি মাংসাশী পাখি।

উপর-নীচ ঃ ২. জ্যোতিষে অশুভ সময় বিশেষ, ৩. পরশুরামের জননী, ৫. মৃতদেহ, ৭. ঔষধাদির জন্যে গাছগাছড়া, ৯. শিব ও পার্বতীর জ্যেষ্ঠপুত্র, ১০. যে বালিতে নৌকো, জন্তু ইত্যাদি ডুবিয়া যায়, ১১. লাউ ১২. পুরাণোক্ত মুনি যাঁহার অস্থিতে বজ্র নির্মিত হইয়াছিল।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৩৭

সঠিক উত্তরদাতা

সৌরভ দাস
সাহাপুর, মালদহ
শান্তনু গুড়িয়া
বেড়াবেড়িয়া, বাগনান,
হাওড়া-৭১১৩০৩
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭০০০০৯
সুনীল বিষ্ণু, সিউড়ি, বীরভূম

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

■	■	ন	দে	র	চাঁ	দ	■
■	■	■	ব	■	■	য়া	■
কা	শী	■	কু	ম	ত	ল	ব
■	ত	ব	ল	■	র	■	■
■	■	চ	■	গ	ণি	ত	■
ম	ন	সা	পূ	জা	■	প	লা
■	মু	■	■	ন	■	■	■
■	চি	ন্তা	জ	ন	ক	■	■

● ৫৩৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ২২ মার্চ, ২০১০ সংখ্যায়

সংস্কৃত নাট্য মহাসম্মেলনে 'সুরভারতী' শিল্পীদের সাফল্য

সংবাদদাতা ॥ ভারত সরকারের "মানবসংসধান-বিকাশ-মন্ত্রালয়ে"র অন্তর্গত "রাষ্ট্রীয়-সংস্কৃত-সংস্থানে"র উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ত্রিপুরায় আগরতলায় ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনদিন ব্যাপী "সর্বভারতীয় সংস্কৃত নাট্য মহাসম্মেলন" সম্পন্ন হ'ল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ডাঃ জ্ঞানদেব যশবন্তরাও পাটীল। সভাপতিত্ব করেন "সংস্কৃত-সংস্থানে"র কুলপতি ডঃ রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সাতটি নাট্যগোষ্ঠী অনুষ্ঠানে সংস্কৃত নাটক পরিবেশন করেন। পশ্চিমবঙ্গ 'সুরভারতী সংস্কৃত ইনস্টিটিউটের' শিল্পীরা গত ১৭ ফেব্রুয়ারি, অধ্যাপক শান্তিনাথ ঘোষ-বিরচিত এবং নির্দেশিত ও মহাভারতের একলব্যের জীবনী অবলম্বনে রচিত "আত্মনিবেদনম্" সংস্কৃতনাটকটি উপস্থাপন করেন। কুলপতি ডঃ ত্রিপাঠী নাটকটির অভাবিত সাফল্যের জন্য "অধ্যাপক শান্তিনাথ ঘোষের হাতে নটরাজের মূর্তিসম্বন্বিত স্মারক স্তম্ভটি তুলে দেন। নাটকটির মঞ্চোপস্থাপনে কণ্ঠসঙ্গীতে ডঃ স্নেহাশীষ ভট্টাচার্য্য ও দীপ্তি ঘোষ, নৃত্যে দেবজিৎ মুখার্জী ও দেবস্মিতা ঘোষ, যন্ত্রসঙ্গীতে শান্তি সরকার, অভিনয়ে অধ্যাপক হরিনাক্ষর দাস, ডঃ নিখিলেশ চক্রবর্তী, মঃ রাকিবুল হাসান, প্রবীর ঘোষ, সুহাষ ঘোষ, সুধীন চ্যাটার্জী, লক্ষ্মীকান্ত মাল, দীপ্তিঘোষ এবং প্রিয়াঙ্কা ঘোষ অংশগ্রহণ করেন।

মানব-দরদী এক দেশপ্রেমিকের কাহিনী

ফিরে দেখা ঃ জ্যোতি বসু

“হায় সেই শোকস্তব্ধ মৌনমিছিল—যে মিছিলের বুক থেকে নীরবেই হয়তো সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল, পাকিস্তান সৃষ্টির নৈতিক ভিত্তি দানের অমর বীর, তোমাকে জানাই লাখো, লাখো, লাখো সালাম”

বিশাখা বিশ্বাস

বন্যাবাহিত জলোচ্ছ্বাস কী মৃত্যুজনিত শোকোচ্ছ্বাসের মতো? জল একসময়ে নেমে যায়, জলস্ফীতি অপগত হয়, তখন চারদিকে থেকে যায় কেবলি কিছু শামুক-গুগলি, ভঙ্গুর পদার্থের খোলস, ক্ষয়প্রাপ্ত খানাখন্দ ভূ-পৃষ্ঠ মাত্র। জলের মতো শোকও এক সময়ে স্তিমিত হয়ে আসে, উচ্ছ্বাস নিম্নগামী হয়, তখন থাকে কী?

ঊনিশ শ’ চল্লিশে তার পার্টিতে প্রবেশের মাত্র বছর দুয়েক পরে বিয়াল্লিশের ৯ আগস্ট সারা ভারতে আছড়ে পড়ে। বৃটিশ ভারতের সেই গণ-অভ্যুত্থান আগস্ট বিপ্লব এবং কমিউনিস্ট পার্টির জন্মলগ্ন থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেন তিনি (এবং তারা)। তাই সেই আগস্ট-আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বল্লেন, এ এক ‘ন্যাশানাল সুইসাইড’—জাতীয় আত্মহনন। মিলিত হিন্দু-মুসলমানের সেই স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে ধর্মীয় ভিত্তিতে বিভাজনের তাগিদে তিনি (এবং তারা) তাই ঘোষণা করলেন—“ইট (মুসলিমদের) মাস্ট বী গিভন্ দ্য রাইট টু সিজেশন”—এদের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার দিতে হবে! তাই ১৯৪৬ সালেই সেই দাবীর সাথে সাযুজ্য রেখেই ভারতের প্রথম ভোট জালিয়াতিতে হুমায়ুন কবীরকে পরাজিত করে বিধানসভায় প্রবেশের পরই সুরাবর্দীর হাত দিয়ে লালঝাণ্ডাকে পাকিস্তানের দরবারে পাঠিয়ে ১৬ আগস্ট মনুমেন্টের তলায় ঘোষণা করলেন ‘ইফ দেয়ার বী নো পাকিস্তান, দেয়ার উইল বী নো ইনডিপেনডেন্স্’—পাকিস্তান নেই, তো, ভারতের স্বাধীনতাও নেই! তারপরই ক্যাবিনেট মিশনে তিনি (এবং তারা) দাবী করলেন “১৭টি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের একটি যুক্তরাষ্ট্র হিসেবেই মাত্র ভারতের স্বাধীনতা চাই” (হায় সেই শোকস্তব্ধ মৌনমিছিল—যে মিছিলের বুক থেকে নীরবেই হয়তো সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল, পাকিস্তান সৃষ্টির নৈতিক ভিত্তি দানের অমর বীর, তোমাকে জানাই লাখো, লাখো, লাখো সালাম)। তারপরই সাতচল্লিশে ভারতের স্বাধীনতাকে ‘ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়’ নামক স্লোগান এবং বস্তুত সেদিন হতেই হয়তো রচিত হলো তার সেই ঐতিহাসিক ‘জীবন্ত কিংবদন্তী’ হবার বিশুদ্ধ জীবনের নব্য ধারাপাত।...

তার জীবন-ভল্লার দুর্বার স্রোতে কর্মের ইতিহাস নামক তরণীখানি ক্রমশ তরতর করে এগিয়ে চলল। রাজনৈতিক সন্ন্যাসী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষকে তিনি বল্লেন ‘চোর’, ডঃ বি.সি. রায়-কে বল্লেন ‘দ্যাট মিস্ট্রিয়াস বার্ড পেট বাই দ্য বিড়লা হাউজ (দেবজ্যোতি বর্মন)।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনকে ‘স্টিফেন হাউসের বেনামি মালিক’ বানাবার পরই বিশ্বাসঘাতক চীনা হানাদারি ও আক্রমণের স্বপক্ষে সেই ঐতিহাসিক অবস্থান গ্রহণ করে, ১৯৬৭ সালে আসানসোলের জনপ্রিয় সেই শ্রমিক নেতাকে হত্যা করিয়ে ‘জননায়কত্ব’ অর্জন করে, সাঁইবাড়ির নরহত্যা ঘটিয়ে শুরু হলো তার মানবনিধন যজ্ঞ। তারপর রাইটার্সের বারান্দায় তার চেম্বারের সম্মুখেই রাজ্য-কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যগণের হাতে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর লাঞ্ছনা, অনুগত পুলিশবাহিনীর সাজানো অভ্যুত্থানের দ্বারা বিধানসভার ভেতরে নিজের সাহসী ভাবমূর্তি নির্মাণ, আরও পরে প্রকাশ্য দিবালোকে সেই ১৯ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীর অগ্নিদাহ, তিলজলার সাহসী ও নিরপেক্ষ ওসি গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের নিষ্ঠুর হত্যা, সাহসী ডিসি বিনোদ মেহেতা ও ইদ্রিস আলীর জীবননাশ এবং অনিতা দেওয়ানকে বানতলায় ধর্ষণশেষে হত্যার পরই তার সেই অমিয় বচন ঃ অমন তো কতই হয়! ওল্টাও—মহান কীর্তির অমর মৃত্যুর মিছিলে হাঁটা পদাতিক—ওল্টাও, ইতিহাসের পাতা ওল্টাও। দ্যাখো, বৌ-বাজারের রসিদ কাণ্ডে খান-সাহেবের আস্তানায় কুমারী সরবরাহের অন্যতমা নেত্রীকে কে দিয়েছিলেন দেশপ্রেমিকের শংসাপত্র, ১২-১৬ মে পুলিশের পোষাক পরিহিত লুম্পেন প্রলেতারিয়েতগণকে পুলিশেরই সাহায্যে প্রায় ২৫০০০ দণ্ডকারণ্য প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের হয় হত্যা নয়তো নিপাত্তা করে দেবার পর কে বলেছিলেন, “কে ওদের ওখানে আসতে বলেছিল”, কার ইঙ্গিতে মুসোলিনীর কালোকুর্তা বাহিনীর আদলে গড়া হয়েছিল লালপুলিশবাহিনী, কার সৌজন্যে রাইটার্সের বারান্দা হতে প্রেস ক্লাব হটাতে উচ্চারিত হয়েছিল ‘চার্জ, চার্জ দেম আউট’, কার বীরোচিত শালীনতায় লালবাজারে যুবতী বিরোধী-নেত্রীকে হাজতে নিক্ষেপ এবং পরে নানারকম লাঞ্ছনার শেষে মধ্যরাত্রির অন্ধকারে তাকে রাজপথে প্রক্ষেপণ, কার জন-নায়কত্বে বিরাটীর সেই ঝুপড়িতে তরুণীদের ধর্ষণ শেষে তার শংসাপত্রপ্রাপ্ত দলীয় মহিলাকর্মীকে দিয়ে ঘোষণা করানো হলো ‘ওদের স্বভাব চরিত্র খারাপ ছিল’?...

মেলাবে না বন্ধু? মিলিয়ে দেখো, চুয়াল্লিশে যিনি ভারত ভেঙে পাকিস্তান সৃষ্টির স্বপক্ষে সওয়াল করেছিলেন, ৪৭ সালে যিনি বাংলা ভেঙে গোর্খাস্তান সৃষ্টির জন্যে স্মারকলিপি দাখিল করেছিলেন, তিনিই (এবং আজ তারাও) বলেছেন, ‘বাংলাকে আর ভাগ হতে দেওয়া যাবে না’। মিলিয়ে দেখো, তেত্রিশটি বছর ধরে যিনি এবং যারা খুন-ধর্ষণ-নির্বাচনে কারচুপি, জালিয়াতি, গৃহাগ্নি, অবশেষে গ্রামের পর গ্রাম উৎসাদন করে দেশে ‘দেশপ্রেমিকের সম্মান প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই তিনিই (এবং তারাও) শিক্ষা-ব্যবস্থার পারলৌকিক কর্ম সম্পাদনের পরই সারা বাংলাকে শ্মশানের উপান্তে উপনীত করে মৃত্যুর পরে (এবং সামান্য পূর্বে) বীরের সম্মান পাচ্ছেন, ভোগের অন্তহীন আড়ম্বরে সাতশ টাকার যে কেরানিটি আজ বহু সহস্র সহস্র মুদ্রা আয়কর ভবনে প্রেরণ করেন—ইনিই তো তারই স্রষ্টা! ক্ষমতার উচ্চ আস্ফালনে দরিদ্র রুধিরপুষ্ট যে মানব-সমাজকে ‘রুদ্ররক্ত অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্ধায়’ চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত বশ্যতায় নামিয়ে আনা হয়েছিল—ইনিই তো তার নির্মাতা!! লালঝাণ্ডা হাত নিয়ে অগ্নিকণা সন্ধ্যার প্রলয়দীপ্ত বিস্ফুলিঙ্গ স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ কুশলী রাজনীতির যিনি চরণবন্দনা করে গেলেন চিরটি কাল—তীব্র বিষে গুপ্তদন্ত ভরাট করে ইনিই তো তার সর্বশেষের সফল শিল্পী!!! দ্যাখো, দ্যাখো বন্ধু, তাই “এক দিকে অসি আর অবজ্ঞা অটল/অন্যদিকে মসী আর শুধু অশ্রুজল।”... কিন্তু, সে কথা তো পরের বারেকার।...

মেলাবে না বন্ধু? মিলিয়ে দেখো, চুয়াল্লিশে যিনি ভারত ভেঙে পাকিস্তান সৃষ্টির স্বপক্ষে সওয়াল করেছিলেন, ৪৭ সালে যিনি বাংলা ভেঙে গোর্খাস্তান সৃষ্টির জন্যে স্মারকলিপি দাখিল করেছিলেন, তিনিই (এবং আজ তারাও) বলেছেন, ‘বাংলাকে আর ভাগ হতে দেওয়া যাবে না’।

Swastika
8 March - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি কেরলের কোল্লামে সরসঙ্ঘচালক মোহনজী ভাগবতের সফর উপলক্ষে আয়োজিত স্বয়ংসেবক সমাবেশের খণ্ডচিত্র। (খবর ৭ পাতায়)

চিত্রকূট-স্রষ্টা নানাজী দেশমুখ এক অনন্ত জীবনের সাক্ষী

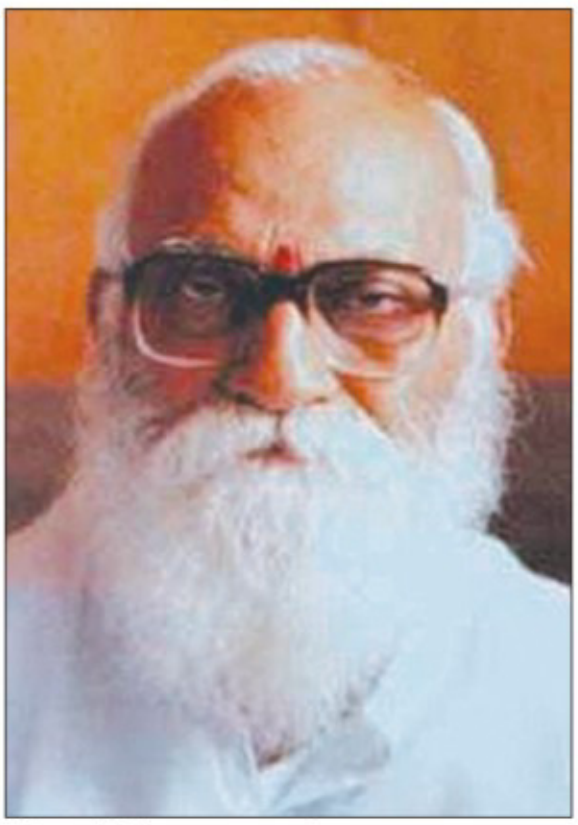

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি চলে গেলেন আম্বাদাস অমৃতরাও দেশমুখ। আপামর ভারতবাসীর কাছে তাঁর পরিচিতি নানাজী দেশমুখ নামেই। ছেলেবেলাতেই বাবা-মাকে হারিয়ে অনাথ ছেলেটির স্থান হয়েছিল মামার বাড়িতে। মামার আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভাল না থাকায় পড়াশুনোর খরচ চালাতে বাজারে সব্জি বিক্রি করে টাকা-পয়সা জোগাড় করতেন তিনি। অবশেষে উচ্চশিক্ষার জন্য নানাজীর ত্যাগ স্বীকার সফল হলো, পিলানীর বিড়লা ইনস্টিটিউট থেকে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হলেন। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের সঙ্গে তাঁদের বাড়ির পারিবারিক যোগ থাকার কারণে ছোটবেলাতেই তাঁকে দেখে উদ্বুদ্ধ হন তিনি। তাই উচ্চশিক্ষার সাথে সাথে চলছিল সঙ্ঘের কাজও। তখন তিনি পুরোদস্তুর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা।

১৯৪০ সালে মৃত্যুর আগে ডাক্তারজী সঙ্ঘের যাবতীয় দায়ভার চাপিয়ে দিয়ে গেলেন গুরুজীর কাঁধে। ভারত-মায়ের অপ্রতিরোধ্য ডাকে নানাজী দেশমুখের যাবতীয় পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। সঙ্ঘের প্রচারক হিসোবে আত্মোৎসর্গ করার ব্রত গ্রহণ করলেন তিনি। গেলেন উত্তরপ্রদেশে। গোরখপুর এলাকার প্রচারক হিসেবে নিজের পরবর্তী কর্মভূমিতে সেই প্রথম পদার্পণ তাঁর। তবে গোরখপুর যাবার আগে তিনি গিয়েছিলেন আগ্রায়। দেখা করেছিলেন পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের সঙ্গে। সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন ভবিষ্যতের কর্মজীবনের সমস্ত রকমের বৌদ্ধিক উপাদান। তখন প্রচারকদের থাকার মতোই জায়গা ছিল না। সেই কারণে বারবার ধর্মশালা পাল্টে পাল্টে থাকতে হোত নানাজী-কে।

১৯৪৭ সাল। স্বাধীনতার আনন্দ আর দেশভাগের বেদনার বিচিত্র মিশেল। আর এস এসের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রধর্ম, পাঞ্চজন্য নামে দুটি সাপ্তাহিক

চিত্রকূট আর নানাজী দেশমুখ যেন একই আত্মার দুটি সত্তা। ...১৯৯৯ সালে নানাজী দেশমুখ পদ্মবিভূষণ পুরস্কারে ভূষিত হন। সৃষ্টি (চিত্রকূট) একদা ছাপিয়ে গিয়েছিল স্রষ্টাকে (নানাজী দেশমুখ)। তবে সেই সৃষ্টির বুকে দাঁড়িয়ে আজ বড় বেশি মনে পড়বে তার স্রষ্টাকে।

এবং স্বদেশ নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সম্পাদনার দায়িত্ব পড়ল ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর কাঁধে। মার্গদর্শক হলেন দীনদয়াল উপাধ্যায়। আর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে প্রকাশনার দায়িত্বভার বর্তালো নানাজী দেশমুখের ঘাড়ে। এর অব্যবহিত পরেই গান্ধীজীর মৃত্যু। আর মিথ্যা দোষারোপে সঙ্ঘের ওপর কলঙ্ক আরোপের সবরকমের 'সরকারি' প্রচেষ্টা। এর মাঝেও অবিচল নানাজী। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর চার বছর পর ১৯৫৭ সালে ভারতীয় জনসঙ্ঘ দীনদয়ালজীর নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়াবার সংকল্প নেয়। গুরুজীর পরিকল্পনামাফিক নানাজী চলে আসেন জনসঙ্ঘে। শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততা। উত্তরপ্রদেশে প্রথম অ-কংগ্রেসী সরকার গড়ার নেপথ্যে ছিলেন তিনি। সেখানকার তাবড় কংগ্রেসী নেতা চন্দ্রভানু গুপ্তাকে একবার নয়, তিন তিনবার স্রেফ বুদ্ধির জোরে টেক্কা দিয়ে পরাস্ত করেন তিনি।

১৯৭৫ সাল। দেশের ওপর নেমে এল জরুরী অবস্থার খাঁড়া। অকুতোভয় চিত্তে জয়প্রকাশ নারায়ণের সহযোগী হিসেবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইন্দিরা গান্ধীর অপশাসন বিরোধী আন্দোলনে। তাঁকে মরনোত্তর শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে গত ২৮ ফেব্রুয়ারির ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস 'আর্কিটেক্ট অব্ অ্যান্টি-এমার্জেন্সী স্ট্রাগল' (জরুরী অবস্থা বিরোধী আন্দোলনের রূপকার) হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হলো। মন্ত্রিসভায় তাঁকে যোগদানের অনুরোধ জানানো হলে তিনি বয়সের (৬১) কারণ দেখিয়ে সবিনয়ে তা অস্বীকার করেন।

১৯৬৯-এ তিনি দেখতে যান মধ্যপ্রদেশের একটি ছোট পূণ্যস্থান চিত্রকূট। 'পূণ্যস্থান' কারণ এই চিত্রকূটেই চোদ্দ বছর বনবাস জীবনের মূল্যবান বারোটা বছর কাটিয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। এখানে এসে দারিদ্র্যের নতুন রূপ দেখলেন নানাজী। ঠাট্টা করে বললেন—আমি 'রাজা রামচন্দ্রের' থেকে 'বনবাসী রামচন্দ্রকেই' বেশি ভালবাসি। এত দুঃখ, এত দারিদ্র্য, এত কষ্টের চিত্রকূটে তিনি সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন—"প্রত্যেকের হাতে কাজ দাও, প্রত্যেকের ক্ষেতে জল দাও।" 'রাজনীতিক নানাজি দেশমুখ' ক্রমে ক্রমে 'সেবক নানাজি দেশমুখ'-এ পরিবর্তিত হলেন। তিনি সেবক, যারা দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্র, তিনি তাদেরই সেবক। প্রথম গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে চিত্রকূটে গড়ে তুললেন

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামের সঙ্গে নানাজী দেশমুখ।

চিত্রকূট গ্রামোদয় বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭২-এ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়-এর একাত্ম মানববাদ-কে স্মরণ করে দীনদয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট গড়ে তুলেছিলেন।

চিত্রকূট আর নানাজী দেশমুখ যেন একই আত্মার দুটি সত্তা। এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছিল স্বস্তিকায়, ২৭ জুলাই, '০৯ সংখ্যায়।

চিত্রকূট ছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য সেবা-প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে গোন্ডা প্রকল্প। এটিও গ্রামোদয় যোজনারই অন্তর্ভুক্ত। তাঁর এই প্রকল্পে এসে গ্রামের মানুষের সঙ্গে সহভোজে যোগদান করেছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডি। পরবর্তীকালে চিত্রকূট এসে সহভোজে অংশ নিয়েছিলেন তখনকার রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামও। তিনি চিত্রকূটে নানাজীর কর্মকৃতিত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছিলেন—"সমস্ত রকমের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ছাড়াও তিনি (নানাজী) যে দীনদয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট গড়ে তুলেছেন, আমি মনে করি তা জাতপাতের সংঘর্ষমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। আমি সেই কারণেই বুঝতে পারছি চিত্রকূটকে ঘিরে থাকা ৮০টি গ্রামে কেন কোনও মকোদ্দমা নেই।" ১৯৯৯ সালে নানাজী দেশমুখ পদ্মবিভূষণ পুরস্কারে ভূষিত হন। সৃষ্টি (চিত্রকূট) একদা ছাপিয়ে গিয়েছিল স্রষ্টাকে (নানাজী দেশমুখ)। তবে সেই সৃষ্টির বুকে দাঁড়িয়ে আজ বড় বেশি মনে পড়বে তার স্রষ্টাকে। তাঁর মরনোত্তর দেহ দান করা হয়েছে দিল্লীর অল্ ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব্ মেডিকেল সায়েন্স-এ।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com